দীপক চৌধুরীর

দীপক চৌধুরীর গল্প

দীপক চৌধুরী

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড কলিকাতা-৩৭

মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়কে—

১৫, বালিগঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা—১৯

দীপক চৌধুরী

মালবিকার ভবিষ্যৎ	...	১
অসত্য শহর	...	১৯
শর্ট স্ট্রীটে কান্না	...	৩৫
সুনন্দার স্বপ্ন	...	৫২
শশাঙ্ক গুপ্তের সাম্রাজ্য বিস্তার	...	৬৭
একটি পুরনো আলিঙ্গন	...	৮৩
মদন মণ্ডলের কলকাতা যাত্রা	...	৯৫
টাইফয়েড	...	১০৭

"The lover is not content with superficial knowledge of the beloved, but strives for intimate discovery and entrance."

—St. Thomas Aquinas

মালবিকার ভবিষ্যৎ

সমস্ত সংসারটা অন্ধকার হয়ে যেতে মাত্র এক মুহূর্ত লাগল।

ষ্টিফেন কোর্টের তিনতলার ঘরে ব'সে মালবিকার মনে হ'ল, কে যেন হঠাৎ সুইচটা টিপে দিতেই ঘরটা ডুবে গেল ঘুটঘুটে অন্ধকারে। মনে হ'ল, জীবনের কোথাও আর এক বিন্দু আলো রইল না।

মালবিকার স্বামী সুনীল রক্ষিত এইমাত্র মারা গেল। ডাক্তার চ্যাটার্জি ঘোষণা করলেন, সুনীলকে বাঁচাতে পারলুম না। বাঁচাবার জন্যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—সত্যিই যথাসাধ্য। দম-দেওয়া গ্রামোফোন থেকে যেন কথাগুলো বেরিয়ে এল। প্রফেশনাল কথা। রোগী মারা গেলে সব ডাক্তারকেই এমনি ধরনের কথা বলতে হয়। ডাক্তার চ্যাটার্জিও বললেন। বলবার পর মালবিকার ওপর কি প্রতিক্রিয়া হ'ল তা পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে অপেক্ষা না ক'রে ডাক্তার চ্যাটার্জি ঢুকে পড়লেন চানঘরে। চান-ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল। সাবান দিয়ে ভাল ক'রে হাত ধুয়ে তিনি ফিরে এসে বললেন, জন্ম এবং মৃত্যু আমাদের হাতের কৃতিত্বের ওপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে না এমন কি পেনিসিলিনের ওপরও। অত্যন্ত দুঃখিত।...নার্স, তোমার তো এখানে কাজ ফুরিয়েছে!—হাত-ঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে তিনি পুনরায় বললেন, এখন মাত্র সন্ধ্যে ছটা। দু ঘণ্টা বিশ্রাম তুমি করতে পার অনায়াসেই। তারপর রাত আটটায় তোমাকে যেতে হবে গলস্টন ম্যানসনের তেরো নম্বর কামরায়। তেরো নম্বর? ও লর্ড! নম্বরটা তো দেখছি—। সে যাক, মিস্টার জনসন বুড়ো মানুষ। আশী পেরিয়ে গেছেন। নম্বরটা যতই দুর্ভাগ্য-সূচক হোক না কেন, তাঁর কোন ভবিষ্যৎ নেই।...অত্যন্ত দুঃখিত মিসেস রক্ষিত। এই নিন ডেথ-সার্টিফিকেট।

ডাক্তার চ্যাটার্জি এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। পেছন থেকে মালবিকা

বললে, একটু দাঁড়ান। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। মালবিকার মনে হ'ল, ডাক্তার চ্যাটার্জি দাঁড়াবার জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে মালবিকা বললে, এই আপনার টাকাটা। আপনি তো যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন—আপনার টাকা।

ও, হ্যাঁ, টাকা।—পকেটে রাখতে গিয়ে ডাক্তার চ্যাটার্জি টাকাগুলো চকিতের মধ্যে গুনে ফেললেন। তারপর বললেন তিনি, একটা দশ টাকার নোট বেশি এসে গেছে। এই নিন।

মালবিকার হাতে সবগুলো টাকাই গুঁজে দিয়ে ডাক্তার চ্যাটার্জি বললেন, সংসারে একা পড়লেন, টাকার প্রয়োজন আপনারই হবে সবচেয়ে বেশি। ইউরোপের যে-কোন ম্যানসনে যদি এমন ট্র্যাজেডি ঘটত, টাকা আমি অবশ্যই নিতুম। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে সুনীল মারা গেল। এই বয়সে ইউরোপেও লোক মারা যায়, কিন্তু আমাদের মত মেয়েরা সেখানে এত অসহায় নয়। হয়তো ক ঘণ্টা শোক করবার পর, উল্টো দিকের আর এক ম্যানসনে গিয়ে সে নতুন স্বামীর সঙ্গে ঘর বেঁধে বসে। মিসেস রক্ষিত, আমি অত্যন্ত দুঃখিত—মানে আমাদের সামাজিক নিয়মগুলোর মধ্যে বড্ড বেশি বর্বরতা।...নার্স, ছটা বেজে পনেরো মিনিট হয়ে গেছে।...বাই দি ওয়ে, সুনীলকে কোথায় পাঠাচ্ছেন? কেওড়াতলায়, না, ক্রিমেটরিয়ামে? আত্মীয়স্বজন কেউ নেই কলকাতায়? আই মীন সুনীলের সঙ্গে প্রায় দশ বছরের পরিচয়, কিন্তু ওর যে কেউ আত্মীয়-স্বজন থাকতে পারে তা আমি কখনও ভেবে দেখি নি। মিসেস রক্ষিত, কোন ঠিকানা যদি জানেন আমি না হয় চেম্বারে গিয়ে টেলিফোন ক'রে দিই?

আমার কোন ঠিকানা জানা নেই ডাক্তার চ্যাটার্জি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু এই ডেথ-সার্টিফিকেট নিয়ে আমি কি করব?

শ্মশানে সরকারী লোক আছে, তাদের দিতে হবে। সঙ্গে টাকা কটাও পাঠিয়ে দেবেন। প্রাচীনকালের মত আমরা আর হিসেব ছাড়া মরতে পারি নে। সরকারী খাতায় নাম ধাম সব লেখা থাকবে। চল্লিশ লক্ষ লোকের মধ্যে

আপনার কি চারজন আত্মীয়কে খুঁজে পাওয়া যাবে না? সুনীলকে কাঁধে তোলবার জন্যে অন্ততপক্ষে চারজন লোকের দরকার। আপনার বয়-বাবুর্চীরা তো কাঁধে তুলতে চাইবে না।

মালবিকা এখনও এতদূর পর্যন্ত ভাবতে পারে নি। কোনও জবাব দিল না সে। ডেথ-সার্টিফিকেট আর টাকাগুলো হাতে নিয়ে মালবিকা এসে দাঁড়াল বিছানার পাশে। সুনীল ঘুমিয়ে আছে। এ ঘুম আর কোনদিনই ভাঙবে না। আরও দু-এক মিনিট অপেক্ষা ক'রে ডাক্তার চ্যাটার্জি চ'লে গেলেন সুনীল রক্ষিতের ফ্ল্যাট থেকে, চ'লে গেলেন ষ্টিফেন কোর্টের বাইরে।

মৃত স্বামীর দিকে মালবিকা চেয়ে রইল অনেকক্ষণ পর্যন্ত। এমন মনোযোগ দিয়ে সে কোনদিনও চেয়ে দেখে নি। বুঝতে পারে নি মালবিকা যে, দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কেবল এই একটা মানুষই জ্বালিয়ে রেখেছিল ওর জীবনের সবটুকু আলো। সত্যিই সবটুকু আলো। স্বামীর মৃত্যুর ঠিক পর-মুহূর্তেই অন্ধকারের স্বাদ পেল ষ্টিফেন কোর্টের মালবিকা রক্ষিত।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নার্স কখন যে চ'লে গেছে, মালবিকা তা টের পায় নি। সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও সে আজ টের পেত না। অনুভূতি-রাজ্যের এ এক বিশেষ অবস্থা, বিশেষ মুহূর্ত, যখন ঘরের দেওয়াল কিংবা আসবাবগুলো পর্যন্ত দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় না। স্বর্গীয় সুনীল রক্ষিতের বয়-বাবুর্চী দুটো দরজার ও-পাশ থেকে উঁকি দিয়েছে বার কয়েক। এখন তারাও আর দরজার ও-পাশে দাঁড়িয়ে নেই। মালবিকার মত বয়-বাবুর্চীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়। ষ্টিফেন কোর্টের চার নম্বর ফ্ল্যাটে নতুন ভাড়াটে আসবে আগামী মাসের প্রথম তারিখে। বয়-বাবুর্চীর কাজ এক রকম পাকা হয়েই আছে। এ মাসের পনেরোটা দিন হয়তো ওদের বেকার থাকতে হবে। সুনীল রক্ষিত মাসের শেষ তারিখে মরলে হিসেবের খাতায় লোকসানের কোন চিহ্ন পর্যন্ত থাকত না। কিন্তু ভাগ্যের হিসেবের সঙ্গে বয়-বাবুর্চীর কিংবা ডাক্তার চ্যাটার্জির হিসেব মিলল না ব'লে লোকসানের সবটুকুই প্রাপ্য কেবল মালবিকার।

কামরার পশ্চিম দিকে ছোট্ট একটা বারান্দা। মালবিকা এসে দাঁড়াল এই বারান্দায়। সামনেই চৌরঙ্গী রোড। রাস্তা আর বাড়িটার মাঝখানে পার্কিংয়ের বেশ খানিকটা জায়গা রয়েছে। অনেকগুলো গাড়ি সেখানে পার্ক করাই আছে। নতুন নতুন গাড়ি অল্প আলোয় বেশ ঝকঝক করছে। ঝকঝক করছে সুনীল রক্ষিতের প্যাকার্ড গাড়িখানাও। ড্রাইভার গুলজার আলি গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে অন্য একজন ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছে। হয়তো বা এরই মধ্যে সে খবর পেয়েছে বেশি মাইনের স্থায়ী চাকরির। কথাটা ভাবতে গিয়ে মালবিকার ঠোঁট দুটো একটু ন'ড়ে উঠল। সে ভাবল, জীবনের কোন কিছুই স্থায়ী নয়।

রাস্তার ও-পাশে গির্জেটায় ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ করল। কাথলিকদের আজ পাম্-সান্ডে। তাই বোধ হয় ওখানে আজ ভিড় জমেছে খুব। সবাই এসেছে প্রার্থনা-মন্দিরে যোগ দিতে। প্রার্থনা? মালবিকা কথাটা দু-তিনবার নিজের মনে মনেই উচ্চারণ করল। মানুষ প্রার্থনা করে কেন? কার কাছে প্রার্থনা করে? সে তো কোনদিনও কারও কাছে কোন প্রার্থনাই জানায় নি! কলেজ থেকে বেরিয়ে আসবার পর সে পেয়েছিল স্বামী—না চাইতেই পেয়েছিল। আজ আবার স্বামী তার চ'লে গেল। চব্বিশ ঘণ্টাই হাতজোড় ক'রে প্রার্থনা করলেও কেউ তার স্বামীকে ধ'রে রাখতে পারত না। ধ'রে রাখতে পারল না কলকাতার একজন সেরা চিকিৎসক ডাক্তার রামতনু চ্যাটার্জিও। গির্জের ঘণ্টা থেমে যাওয়ার পর হঠাৎ যেন মালবিকার মনে হ'ল যে, কেবল ডাক্তার চ্যাটার্জিকে না ডেকে সে যদি তন্ময় হয়ে অন্য কাউকে ডাকতে পারত, হাতজোড় ক'রে প্রার্থনার ভঙ্গিতেই সে ডাকত, তবে—। মালবিকা ব্যাপারটা আর তলিয়ে দেখতে চাইল না। সুযোগ থাকতে যখন সে ব্যাপারটা কোনদিনও তলিয়ে দেখে নি, আজ আর সে কথা ভেবে লাভ কি? লাভ? লাভ-লোকসানের হিসেব সে চুকিয়ে দিয়েছে—দিয়েছে চিরজন্মের মতন।

সুনীল রক্ষিতের ওপর এখন প্রার্থনার প্রলেপ লাগালেও শবদেহের পচন সে আর কোনরকমেই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

ষ্টিফেন কোর্টের বড় গেট দিয়ে একটা তেলেগু আয়া ভেতরে আসছিল। ময়দান থেকে ফিরছে সে। কোন এক নাম-না-জানা সাহেবের বাচ্চাকে সে প্র্যামে' বসিয়ে রোজই নিয়ে যায় ময়দানের দিকে। সন্ধ্যের একটু পরেই তেলেগু আয়া ফিরে আসে বাচ্চাকে নিয়ে। আজও সে ফিরছে। মালবিকার মনে হ'ল, সে তার নিজের বাচ্চাকে কোনদিনও এমন ক'রে একজন ভাড়াটে আয়ার কাছে ছেড়ে দিত না। বিকেলের দিকে স্বামী-স্ত্রীকে ক্লাবে যেতে হয় ব'লে ওরা বাচ্চার দায়িত্ব আয়ার ওপর ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু সন্তানের জন্যে মালবিকা পারত ক্লাবের আকর্ষণ ছেড়ে দিতে অতি অনায়াসেই। বাঙালী মায়ের মর্মকথা যেন দুনিয়ার অন্য কোন মায়ের মর্মকথার সঙ্গে মেলে না। সাহেবের বাচ্চাটার দিকে চেয়ে এই মুহূর্তে মালবিকার সমস্ত দেহে কেমন একটা স্পন্দন এল। শান্ত নদীর জল ঝিরঝিরে বাতাসে যেমন ক'রে একটু হালকা-ভাবে হেলে দুলে ওঠে, মালবিকার দেহমনও যেন তেমনি ভাবে কোন্ এক প্রেরণা-স্পর্শে পুলকিত হয়ে উঠল। ইচ্ছে হ'ল, সে লাফিয়ে নেমে যায় নীচে। গিয়ে তেলেগু আয়াটাকে এক বছরের আগাম মাইনে দিয়ে বিদায় ক'রে দিয়ে আসে। তারপর বাচ্চাটাকে নিজের বুকের ওপর চেপে ধ'রে সে উঠে আসে ষ্টিফেন কোর্টের তিনতলায়।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল মালবিকা। হঠাৎ ও চমকে উঠল। ষ্টিফেন কোর্টের বড় ফটকের দিক থেকে একটা অসহায় চিৎকার বাতাসের গায়ে ভর দিয়ে যেন উঠে এল বারান্দা পর্যন্ত। মালবিকার ভাঙা বুকের ওপর চিৎকারটা যেন হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল টুকরো টুকরো হয়ে। মালবিকা পরিষ্কার দেখতে পেল, একটা নতুন ঝকঝকে মাস্টার ব্যুইক ফটক দিয়ে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ ব্রেক ক'ষে বসল। কিন্তু তার আগেই বাচ্চার চিৎকার উঠে এসেছে বারান্দা পর্যন্ত। তেলেগু আয়ার চিৎকার মালবিকা শুনতে পেল না।

মালবিকা মুহূর্তের মধ্যে ঘেমে উঠল অপরিমিতভাবে। স্টিফেন কোর্টের বাতাস আজ সাহারার বাতাসের চেয়েও বেশি গরম। মালবিকা ছুটে চ'লে এল কামরার মধ্যে। হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়ল শবদেহের পাশে—স্বামীর শবদেহ। সে অনুভব করল, মাদ্রাজের উপকূল থেকে একটা দমকা বাতাস ছুটে আসছে—পার হচ্ছে বঙ্গোপসাগর। পার হওয়ার পথে সে সংগ্রহ ক'রে নিচ্ছে জলকণা। প্রতি মিনিটে দমকা হাওয়ার গতি বাড়ছে। মালবিকার মনে হ'ল, এই গর্জনশীল প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা বুঝি ওর বুকের ওপর এসে ধাক্কা খাবে। ধাক্কা খেয়ে জলকণাগুলো ভেঙে পড়বে। ওর সারা অস্তিত্ব জুড়ে বুঝি আজ নামবে কান্নার মনসুন। ইচ্ছে হ'ল, মনসুন নামবার আগে সে একবার চিৎকার ক'রে উঠবে। একটা চিৎকারে স্টিফেন কোর্টটাকে ফাটিয়ে দিতে পারলে মালবিকা বোধ হয় আজ একটু আনন্দের আস্বাদ পেত। কিন্তু একটু পরেই মালবিকা ভাবলে, বয়-বাবুর্চীগুলো বোধ হয় আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে মালবিকার প্রতি পদক্ষেপ। চিৎকার করতে গিয়ে ওর মনে এল লজ্জা। তারপর এল সৌজন্যবোধ। ও-পাশের ফ্ল্যাটের মানুষগুলোর জীবনযাত্রায় বিঘ্ন ঘটানো উচিত হবে না। উচিত হবে না ওর দুঃখের অংশ নেবার জন্যে অন্য পাঁচজনকে সজাগ ক'রে তোলা। শবদেহের পাশে নতজানু হয়ে মালবিকা হাত জোড় করল। চিৎকার করার চেয়ে প্রার্থনা করা অনেক সোজা। প্রার্থনার বিশেষ কোন মন্ত্র ওর জানা নেই। না থাক্, এবার সে নিজের মন্ত্র নিজেই মনে মনে ঠিক ক'রে নেবে। ঠিক ক'রে নেবার জন্যে মালবিকা মনটাকে কেন্দ্রীভূত ক'রে ফেলল নিজের কামরার মধ্যে। স্টিফেন কোর্টের ফটকের দিকে সে আর কিছুতেই কান পাতবে না। মালবিকা ধ্যানে বসল। ধ্যানের ময়দানে তেলেগু আয়া ঘুরে বেড়াতে লাগল সাহেবের বাচ্চাটাকে নিয়ে। মালবিকা প্রার্থনা করতে লাগল, স্টিফেন কোর্টের ফটক দিয়ে তেলেগু আয়া যেন আর কোনদিনই প্রবেশ না

করে। স্বামী আর পরের শিশুর মধ্যে কোন ব্যবধান রইল না মালবিকার প্রথম প্রার্থনায়।

। দুই ।

কলকাতার এক মেয়ে-কলেজ থেকে মালবিকা গত বছর বি. এ. পাস করেছে। পরীক্ষার ফলাফল বেরুবার আগেই তার বিয়ে হয়ে যায় সুনীল রক্ষিতের সঙ্গে। মালবিকার বাবা নেই, বিধবা মা থাকেন শিলংয়ে তাঁর বড় ছেলে রমেনের কাছে। রমেন সেখানে চাকরি করে।

ওঁরা এসেছিলেন শিলং থেকে কলকাতায় মালবিকার বিয়ে দেবার জন্যে। তাঁদের আসতেই হয়েছিল। কন্যাপক্ষের টাকায় কলকাতার সব আত্মীয়-স্বজনেরা শিলং বেড়িয়ে আসবার সুযোগ পাবে ব'লেই সুনীল যেন কলকাতার বাইরে গিয়ে বিয়ে করতে রাজী হয় নি। তা ছাড়া বিলিতী কোম্পানির সাহেবসুবোরা সে বিয়েতে যোগ দিতে পারত না। সুনীল রক্ষিত খুবই অল্প বয়সে সাহেব কোম্পানিতে বড় চাকরি পেয়েছে। কলকাতার আত্মীয়-স্বজনেরা খুবই চেষ্টা করেছিল সুনীল যেন বড় চাকরিটা না পায়। হয়তো সেই কারণেই বিয়ের রাত্রে সে কোন আত্মীয়কে ডাকে নি সঙ্গে যাবার জন্যে।

বিয়ের এক মাস আগে রমেন তার মাকে নিয়ে এসে উঠল এক হোটেলে। কলেজের হস্টেলে থাকত মালবিকা। দু-চার দিনের মধ্যেই রমেন ভাড়া ক'রে ফেলল জয়গোবিন্দ-হাই-ইস্কুলের বাড়িটা। গরমের ছুটি আরম্ভ হয়ে গেছে। অতএব সেক্রেটারির হাতে শ পাঁচেক টাকা দিয়ে বাড়িটা এক মাসের জন্যে ভাড়া নিতে রমেনের কোন অসুবিধে হ'ল না। মা এবং দাদার সঙ্গে মালবিকাও উঠে এল জয়গোবিন্দ-হাই-ইস্কুলে। খুব হৈ-চৈ ক'রে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে লাগল রমেন। মালবিকা বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছে। বয়স বেড়েছে তার, সেই সঙ্গে বেড়েছে বিদ্যা। তাই সে একদিন রমেনকে বললে, বড্ড লজ্জা

পাচ্ছি দাদা, তোমার এই বিরাট আয়োজন দেখে। সামান্য একটা বিয়ের জন্যে এত খরচ করছ কেন ?

বাবার টাকাই তো খরচ করছি। মারা যাবার আগে তিনি তোর বিয়ের জন্যে পনেরো হাজার টাকা রেখে গিয়েছিলেন।

কিন্তু টাকা থাকলেই নষ্ট করতে হবে—সে কথা তো বাবা ব'লে যান নি। তা ছাড়া দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, পাটনা এবং নাগপুর থেকে আসা-যাওয়ার ভাড়া দিয়ে আত্মীয়স্বজনকে ডেকে আনছ কেন দাদা ?

সহসা জবাব দিতে পারল না রমেন।

কাটা-বাংলার ভাঙা হাটে কেবল জয়গোবিন্দ-ইস্কুলটাকে এক রাত্রের জন্যে ইলেকট্রিক আলো দিয়ে সাজিয়ে রাখবার মধ্যে আর যাই থাক্, রুচি নেই দাদা।—বেশ একটু জোর দিয়েই কথাটা বললে মালবিকা।

চুপ ক'রে থাকা আর বাঞ্ছনীয় নয় মনে ক'রেই রমেন এবার ধীরে ধীরে বলতে লাগল, তুই একটু ভুল বুঝেছিস বোন। দু দিকের ভাড়া দিয়ে আত্মীয়-স্বজনকে ডেকে আনবার মধ্যে তুই কেবল টাকার লোকসান দেখছিস, কিন্তু লাভের দিকটা দেখছিস না !

তুমি দেখিয়ে দাও দাদা।

দেখিয়ে দিলেও তোরা আর দেখতে চাইবি না। কাগজ আর ছাপাখানার রেট সস্তা হওয়ায় সমস্ত পৃথিবী জুড়ে চলেছে বিদ্যার প্রহসন। যার যা মনে আসছে, তাই তারা লিখে যাচ্ছে। তোরা সেই সব প'ড়ে প'ড়ে চারদিকে কেবল লোকসানই দেখতে পাচ্ছিস।

লাভটা তুমিই একটু দেখিয়ে দাও।—লাভ দেখবার জন্যে মালবিকা যেন একটু ব্যস্ত হয়ে উঠল।

রমেন বললে, বাবা মারা গেছেন আজ প্রায় দশ বছর হ'ল। তার পর থেকে আমরা কেউ কোন আত্মীয়স্বজনকে চোখে দেখি নি। তুই তো বোধ হয় জ্যেঠামশাই কিংবা ছোট কাকার নাম পর্যন্ত জানিস না। মালবিকা,

আমাদের সামাজিক জীবন ইউরোপের সঙ্গে মেলে না। তাই বিয়ে এবং পূজোপার্বণ উপলক্ষে ভাই বন্ধু আত্মীয়স্বজনকে আমরা ডাকি। স্নেহ এবং ভালবাসার আদান-প্রদানের মধ্যে খরচের কথাটা আমরা ভুলে যাই। কিন্তু তোদের কাছে আজ আত্মীয়তার কোন মূল্য নেই। ভালবাসার বাজারদর দেখবার জন্যে তোদের তাই খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ওলটাতে হয়। তর্ক ক'রে কোন কথাই তোকে বোঝাতে পারব না। তোর টাকা, ইচ্ছে করলে তুই সবটাই ক্যাশ নিতে পারিস। শুনেছি, সুনীল একটা বড় গাড়ি কিনতে চায়। হয়তো এই টাকাটা তার কাজে লাগতে পারে।

সব টাকাটাই অবশ্য মালবিকা নগদ নেয় নি। প্যাকার্ড গাড়ি কেনবার জন্যে সুনীলের কম পড়ছিল পাঁচ হাজার টাকা। তা সে পেয়েছে মালবিকার কাছ থেকে বিয়ের রাত্রেই। বাকি দশ হাজার টাকা খরচ হ'ল বিয়ের উৎসবে। দিল্লী-পাটনার আত্মীয়দের ভাড়ার টাকা পাঠানো হয় নি ব'লে তাঁরা কেউ এলেন না। কলকাতায় যাঁরা ছিলেন, তাঁরা এসে বরকনেকে আশীর্বাদ ক'রে গেলেন। বিয়ের সাত দিন পরেই রমেন মাকে নিয়ে চ'লে গেল শিলং। মালবিকা এসে উঠল স্টিফেন কোর্টে।

বিয়ের রাত্রিটা মালবিকা আজও ভুলতে পারে নি। জয়গোবিন্দ-ইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর কামরাটা বড় ব'লে সেখানেই ওদের বাসরঘর সাজানো হয়েছিল। জয়লক্ষ্মী ডেকোরেটার কোম্পানির লোকেরাই সাজিয়ে দিয়েছিল। দিল্লী-পাটনার বোনেরা এলে হয়তো এর চেয়ে ভাল ক'রে তারা সাজাতে পারত না। পারত না তা ঠিক, কিন্তু জয়গোবিন্দ-ইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় তারা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারত। ভাড়াটে ডেকোরেটারের সৌন্দর্যবোধকে ছাপিয়ে যেত ওদের প্রাণের প্রাচুর্য। কোটি টাকার মধ্যেও যে অভাব থাকতে পারে, মালবিকার তা জানা ছিল না। তাই বাসরঘরে সে বিয়ের রাত্রে কোন অভাবই দেখতে পায় নি।

রাত দশটার পর মালবিকা স্বামীর সঙ্গে বাসরঘরে এসে ঢুকল। ঢুকল

সে সুনীল রক্ষিতের বউ হয়ে। মালবিকা জনতা চায় নি, চেয়েছিল জন—কেবল একজন। আজ তারই সঙ্গে সে এক শয্যায় শয়ন করছে। মালবিকার স্বামীভাগ্য গণৎকারের গণনাকে ভুল প্রমাণ করেছে। ঠিকুজির ছকে সুনীল রক্ষিত ভাগ্যবান ব'লে ধরা পড়ে নি। সে সব হাস্যকর গণনা-বিজ্ঞানের কথা মালবিকার আজ মনে ছিল না। থাকবার কথাও নয়।

শুয়ে পড়েছে মালবিকা। বড্ড পরিশ্রান্ত ওরা দুজনেই। সুনীল রক্ষিত পাখার গতিটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে এল। তারপর দরজাটায় দিল খিল লাগিয়ে। নতুন খিল। জোরে চেপে ধরলে কাঁচা রঙ হয়তো হাতের সঙ্গে উঠে আসত। বাসরঘরের দরজায় খিল লাগাতে হবে—সে কথা রমেনের মনে পড়েছিল শেষ-মুহূর্তে। বউবাজার থেকে ছুতোর মিস্ত্রি ধ'রে এনেছিল সে নিজেই। বর্মা-টীকের অভাব ব'লে সে সঙ্গে ক'রে কিনে নিয়ে এল এক নম্বর সি. পি. টীক। খিলটা শক্ত হওয়া চাই। দাদার ব্যবস্থায় মালবিকা মনে মনে খুশি হয়েছে, শক্তি বেড়েছে মালবিকার। দু-চার জন চোর-ডাকাতের সাধ্য নেই বাসরঘরের দরজা ভেঙে দানসামগ্রী চুরি করার। চুরি তবু হ'ল। হ'ল এক বছর পর। সুনীল রক্ষিতকে ধ'রে রাখতে পারল না মালবিকা, ধ'রে রাখতে পারল না ডাক্তার চ্যাটার্জিও।

জয়গোবিন্দ-ইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় খিল পড়ল। শুয়ে পড়বার আগে সুনীল রক্ষিত জিজ্ঞাসা করলে, ও-পাশের জানলাটা বন্ধ করব ?

আজ কি দরকার বন্ধ করবার ? খোলাই থাক্।

আলো আসছে।

একটু পরেই নিবে যাবে।—বললে মালবিকা। এমনভাবে বললে যেন দুজনের মধ্যে অনেক দিন আগে থেকেই আলাপ-পরিচয় ছিল। প্রথম পরিচয়ের আগ্রহ কিংবা বিস্ময়ের সুর শোনা গেল না এদের প্রশ্ন এবং জবাবের মধ্যে।

জানলা দিয়ে কেউ উঁকি দেবে না তো ?—জিজ্ঞাসা করল স্বামী সুনীল রক্ষিত।

উঁকি? উঁকি দেবার মত মেয়ে কোথায় জয়গোবিন্দ-ইস্কুলে? কলকাতার শিক্ষিত সমাজ থেকে যারা নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল, তারা ডিনার খেয়ে বাড়ি ফিরে গেছে অনেকক্ষণ আগেই। উৎসব ও আমোদপ্রিয় ছোট ছোট বোনেরা তো দিল্লী-পাটনা থেকে আসতে পারে নি। এসব কথা মালবিকার মনেই এল না। সে বললে, উঁকি দেবার মত ভাল্‌গার মনোবৃত্তি এখানে কারও নেই। মালবিকার জবাবটা মুগ্ধ করল সুনীল রক্ষিতকে। মুগ্ধ হওয়ার পর সে তার এটাচি থেকে রাত্রের পোশাক বার করল। কি মনে ক'রে মালবিকা বললে, ওটা আজ নাইবা পরলে! একটা রাত ধুতি প'রেই কাটিয়ে দাও।

আচ্ছা, তাই দিই।

প্রথম রাত থেকেই স্বামী তার অনুরোধ রাখছে দেখে মালবিকার গর্ব হ'ল খুব। সে চোখ খুলে দেখলে, গোটা সংসারটা যেন প্রথম রাত্রেই ওর একেবারে একলার সম্পত্তি হয়ে উঠেছে। কেউ সেখানে নেই। অনাবশ্যক জনতাকে সরিয়ে দিয়েছে তার স্বামী। স্বামী ছাড়া মালবিকা আর কাউকে সেখানে দেখতে পেল না।

বাতিটা এবার নিবিয়ে দিয়ে সুনীল রক্ষিত শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়বার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল মালবিকার স্বামী। হঠাৎ যেন মালবিকার ভয় করতে লাগল। মনে হ'ল, সে একলা। সারাটা জীবন সুনীল রক্ষিত এমনি ক'রে পাঁচ মিনিটের মধ্যে হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে। তার পর শুরু হবে ওর নিঃসঙ্গ-জীবনের লম্বা লম্বা মুহূর্তগুলো। স্বামী-ভাগ্যের গর্ব যেন এরই মধ্যে গ'লে গ'লে ক্ষ'য়ে যেতে লাগল জয়গোবিন্দ-ইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়।

ঘুম আসছে না মালবিকার। প্রথম পুরুষের সঙ্গে ঘর করবার উন্মাদনা ওর ঘুম কেড়ে নিতে পারে নি। ঘুম কেড়ে নিয়েছে ওর দেওয়ালে-টাঙানো ব্ল্যাক-বোর্ডটা।

ধবধবে সাদা দেওয়ালের ওপর ব্ল্যাক-বোর্ডের দিকে চেয়ে রইল মালবিকা।

তৃতীয় শ্রেণীর বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা খড়িমাটি দিয়ে আঁকা-বাঁকা লাইন টেনে রেখেছে। তার মধ্যে ছড়িয়ে আছে দু-চারটে অক্ষর। সাদা অক্ষর। বাইরের আলো এসে পড়েছে ব্ল্যাক-বোর্ডের ওপর। মাঝে মাঝে মালবিকার মনে হতে লাগল, ওই কালো পৃথিবীর ওপর দিয়ে সারি বেঁধে চলেছে সব শিশুর দল। খড়িমাটির রেখা ওগুলো নয়।

ইস্কুলের ঘড়িতে বারোটা বাজল। রাত বারোটা। আজ আর ওর ঘুম আসবে না। এবার ওকে ঘুমুতে দিচ্ছে না ওই শিশুগুলো। মালবিকার মনে হ'ল, ওর সমস্ত দেহের মধ্যে কি রকম একটা শিহরণ এসেছে। ছেলেগুলো বুঝি ওর দেহের ওপর দিয়েই সারি বেঁধে চলেছে। মালবিকা উঠে এল বিছানা থেকে। দাঁড়াল এসে জানলার কাছে। তার পর যেন রাগ ক'রেই জানলাটা দিল বন্ধ ক'রে।

ভাগ্যের ব্ল্যাক-বোর্ড থেকে কালো রঙটা মুছে দিতে চাইল মালবিকা রক্ষিত।

। তিন ।

আজও রাত বারোটা বেজে গেছে। মালবিকার ঘুম আসছে না। শবদেহের পাশে নতজানু হয়ে ব'সে আছে ও। হাত জোড় ক'রে বোধ হয় প্রার্থনা করছে। শবদেহটার মূল্য আর কাণাকড়িও নেই, তা সে জানে। সারা জীবন ধ'রে প্রার্থনা করলেও সুনীল রক্ষিত আর প্যাকার্ডে চেপে অফিসে যেতে পারবে না। পারবে না একটু ন'ড়ে উঠতেও। মালবিকা ক্রমে ক্রমে ডুবে যেতে লাগল নিরাশার অন্ধকারে। চেপে ধরবার মত একটা ভাসমান কুটো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না সে।

চৌরঙ্গীর রাস্তায় ট্রাম চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। মালবিকা উঠে এসে দাঁড়াল বারান্দায়। কোথাও কাউকে দেখতে পেল না সে। গ্যারেজে গাড়ি

তুলে দিয়ে ড্রাইভারটা বস্তিতে ফিরে গেছে। দু-এক বোতল দেশী মদ না খেয়ে লোকটা নাকি ঘুমুতে পারে না। মালবিকা জানে, আজও তার সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নি। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নার্সটা কাছে থাকলেও মালবিকা এতটা অসহায় বোধ করত না। কিন্তু সেও চ'লে গেছে সন্ধ্যের পরেই। গলস্টন ম্যানসনের তেরো নম্বর কামরায় রাত আটটা থেকে শুরু হয়েছে তার নতুন ডিউটি। ডাক্তার রামতনু চ্যাটার্জি? তিনিই বা কি করবেন? সমস্ত দিনটা তাঁর হাড়ভাঙা খাটুনি। তা ছাড়া প্রতিদিনই হয়তো তাঁকে দু-একটা ক'রে ডেথ-সার্টিফিকেট লিখতে হয়, কোন রকম মৃত্যুই আর তাঁকে চঞ্চল ক'রে তুলতে পারে না। লাফিয়ে পড়বে না কি এখান থেকে?— ভাবল মালবিকা। নৈরাশ্যের হাতুড়ি ঘা মেরে মেরে ওর সমস্ত অনুভূতিকে যেন অবশ ক'রে ফেলছে। ব্ল্যাক-বোর্ডের কালো রঙটা বুঝি সমস্ত সংসারটাকে অন্ধকার ক'রে দিয়েছে। কিন্তু কোন অন্ধকারই তো চিরস্থায়ী নয়। মালবিকা একটু ঝুঁকে দাঁড়াল সামনের দিকে। চোখ দুটো যেন এগিয়ে নিয়ে গেল ব্ল্যাক-বোর্ডের কাছে। খড়িমাটি দিয়ে লেখা সাদা অক্ষরগুলো ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। ব্ল্যাক-বোর্ড যত কালোই হোক, ওই সাদা অক্ষরগুলো সে গিলে খেতে পারে নি। মালবিকা যেন অক্ষরগুলোর মধ্যে আশার আলো দেখতে পেল। দেখতে পেল, মৃত্যুর অন্ধকার ভেদ ক'রে ফুটে বেরিয়ে আসছে জীবনের আলো। যেন ওর দেহের ওপর দিয়ে আজ আবার সেই জয়গোবিন্দ-ইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর বাচ্চাগুলো মার্চ ক'রে চলেছে। সাদা অক্ষরের সারি।

ষ্টিফেন কোর্টের ফটক দিয়ে ডাক্তার চ্যাটার্জির গাড়িখানা ঢুকল। মালবিকা চ'লে এল ভেতরে। দাঁড়াল এসে মৃত সুনীল রক্ষিতের পাশে। ঘরের দরজা খোলাই ছিল। মালবিকা লক্ষ্য করলে, ডাক্তার চ্যাটার্জির পদক্ষেপে আজ আর রোগী দেখবার তাড়া নেই। ভিজিট গুনবার গোপন মনস্তত্ত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে ডাক্তার রামতনু চ্যাটার্জির মন। রাত বারোটার পর আজ

আর তিনি দুনিয়ার কোন ওষুধের নামই স্মরণ করবার চেষ্টা করবেন না। জীবনে বোধ হয় এই তিনি প্রথম রাত বারোটার পর বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন কেবলমাত্র একজন অসহায় মহিলার খবর নেবার জন্যে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের বাইরে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার রামতনু চ্যাটার্জি। জিজ্ঞাসা করলেন, সৎকারের কোন ব্যবস্থা করেন নি ?

কেমন ক'রে কি ব্যবস্থা করতে হয়, আমি তা জানি না।—জবাব দিল মালবিকা।

ক্রিমেটরিয়ামে নেওয়াই ভাল।

আপনি যা ভাল মনে করেন করুন। ড্রয়ার থেকে দুখানা এক শো টাকার নোট নিয়ে মালবিকা তুলে ধরল ডাক্তার চ্যাটার্জির দিকে।

টাকাটা আপনি রেখে দিন আপনার কাছেই। আমি সব ব্যবস্থাই ক'রে এসেছি। সৎকার-সমিতির লোকদের খবর দিয়েছি। এক্ষুনি এসে পড়বে ওরা।

মিনিট পনরো পরেই সৎকার-সমিতির লোক এসে নিয়ে গেল সুনীল রক্ষিতের শবদেহ। তাকে ধ'রে রাখবার জন্যে মালবিকা এতটুকু চেষ্টা করল না। চোখ দিয়ে জল ফেলল না এক ফোঁটাও। সাদা অক্ষরগুলোর মধ্যে মালবিকা বোধ হয় নতুন জীবনের আভাস পেয়েছে। মেঝের ওপর ব'সে রাত কাটাল মালবিকা। সেই সঙ্গে রাত জাগলেন ডাক্তার চ্যাটার্জিও।

সাত দিন কেটে গেল। কাটল পনরো দিনও। ডাক্তার রামতনু চ্যাটার্জি প্রতিদিনই আসেন। আসেন সন্ধ্যের দিকেই। মালবিকাকে সঙ্গ দেন তিনি। মালবিকার ভাঙা-ভবিষ্যৎ জোড়া লাগাবার প্রেসক্রিপশন তিনি তৈরি করছেন।

সেদিন মালবিকা দুপুরবেলা বাড়ি ছিল না। ডাক্তার চ্যাটার্জি দুপুর-বেলায়ই এসে উপস্থিত হলেন স্টিফেন কোর্টে। ঘরে ঢুকে দেখলেন, আসবাবপত্র কিছুই নেই। মালবিকার নিজের ব্যবহৃত খাটখানা পর্যন্ত উধাও হয়েছে।

মেঝেতে প'ড়ে রয়েছে মালবিকার বিছানা। ডাক্তার চ্যাটার্জি বিস্মিত হলেন খুবই। মনে হ'ল, মালবিকা যেন তাঁকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বার ক'রে দেবার জন্যেই আসবাবগুলো সব সরিয়ে ফেলেছে। এত বড় একজন ডাক্তারের ঘাড়ে হাত দেবার মত সাহস এবং শক্তি সে পেল কোথা থেকে? তাঁর চল্লিশ বছরের জীবনে এই তিনি প্রথম ধাক্কা খেলেন। ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা আছে ব'লেই তিনি হয়তো আজও বিয়ে করেন নি। স্বর্গীয় সুনীল রক্ষিতের শূন্য ঘরে পায়চারি করতে করতে ডাক্তার চ্যাটার্জি ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। চল্লিশ লক্ষ লোকের মধ্যে বাস ক'রেও মানুষ যে কতটা অসহায় হতে পারে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সেদিন তিনি পেয়েছিলেন মালবিকাকে দেখে। মালবিকার ভাঙা-ভবিষ্যৎ জোড়া লাগাবার জন্যেই তিনি তাকে বিয়ে করবেন ব'লে আজ মন স্থির ক'রে এসেছিলেন ষ্টিফেন কোর্টে। গত পনেরো দিনের অর্ধেকটা সময়ই তিনি কাটিয়েছেন তাঁর প্রফেশনের বাইরে—ষ্টিফেন কোর্টের এই আবদ্ধ ঘরে। আর আজ এখানে তাঁর বসবার মত এক টুকরো আসবাব পর্যন্ত নেই।

মালবিকার সঙ্গে দেখা না ক'রে তিনি যাবেন না মনে ক'রেই ব'সে রইলেন মেঝের ওপর। শূন্য মেঝে। শূন্য মেঝেতে দু ঘণ্টা ব'সে থাকবার মত এমন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা তিনি আজ বাড়ি গিয়ে ডায়ারিতে লিখে রাখবেন। দু ঘণ্টা কেটে গেল, কাটল তিন ঘণ্টাও। এতে কেবল সময়ের অপচয়ই হ'ল না, হয়তো দু-চারটে জীবনও নষ্ট হ'ল। পেনিসিলিন দিতে পারলেন না ব'লে হয়তো গত তিন ঘণ্টার মধ্যে গোটা তিনেক রোগী তাঁর মারা গেছে। ডাক্তার চ্যাটার্জির লজ্জা ও ক্ষোভ বাড়তে লাগল প্রতি পলে পলে। তিনি বুঝলেন, মালবিকার ভাঙা-ভাগ্য জোড়া দিতে না এসে অন্য কোথাও পেনিসিলিন নিয়ে ছোটাছুটি করা উচিত ছিল তাঁর। তিনি ভাগ্য জোড়া দেওয়ার ডাক্তার নন, তিনি পেনিসিলিনের ডাক্তার। কিন্তু এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। মালবিকার সঙ্গে দেখা না ক'রে গেলে হয়তো পরবর্তী জীবনে

তাঁর লজ্জা ও ক্ষোভের পরিমাণ বাড়তেই থাকবে। তা ছাড়া মালবিকার অসহায়ত্বের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন। ভালবেসেছেন মালবিকাকে। ভালবাসা পেনিসিলিনের চেয়ে যে বড় ওষুধ, সে সত্য তিনি আবিষ্কার করেছেন। তবে কেন মালবিকা আজ তাঁকে ফিরিয়ে দিতে চায় ?

সন্ধ্যে হয়ে এল। ডাক্তার চ্যাটার্জি মেঝে থেকে উঠে বারান্দায় এলেন। তিনি দেখলেন, কলকাতার আকাশ কালো হয়ে আসছে। সরু সরু গলি-গুলোতেও অন্ধকার নামবে। দুনিয়ার শয়তানেরা গলিগুলোতে গা ঢাকা দিয়ে আছে। আর একটু পরে তারা ছড়িয়ে পড়বে সারা কলকাতায়। মালবিকা এখনও ফিরল না। সুনীল রক্ষিতের কোন আত্মীয়ের সন্ধান রাখে না মালবিকা। তবে সে গেল কোথায় ? ডাক্তার চ্যাটার্জি শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। লালবাজারে একবার টেলিফোন ক'রে দেখলে কেমন হয় ?

ট্যাক্সি থেকে নেমে মালবিকা ভাড়া চুকিয়ে দিল। ডাক্তার চ্যাটার্জি বারান্দায় দাঁড়িয়েই দেখলেন ওকে। মিনিট দুয়েক বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি ঘরে ঢুকলেন। ঢুকল মালবিকাও।

সে বললে, আমি জানতুম—আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন।

এইমাত্র দাঁড়িয়েছি। তিন ঘণ্টার ওপর ব'সে ছিলুম তোমার এই খালি মেঝেতে।—তিক্ত স্বর ভেসে উঠল ডাক্তার চ্যাটার্জির কণ্ঠে।

বড্ড লজ্জিত বোধ করছি ডাক্তার চ্যাটার্জি। আসবাবগুলো সব বেচে দিয়েছি জলের দামে। গাড়িটা কিনে নিয়েছেন ওঁর অফিসের বড় সাহেব। আমাদের কেনা দামই তিনি দিয়েছেন।

গিয়েছিলে বুঝি বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে ?

না। তিনি আজ সকালে নিজেই এসেছিলেন।

বসতে দিলে কোথায় ?

তখনও আসবাবগুলো ছিল। ডাক্তার চ্যাটার্জি, আপনার ঋণ আমি কোনদিনও শোধ করতে পারব না।

আমি কিছু ধার দিয়েছি ব'লে তো মনে পড়ছে না!

মালবিকা তার বিছানা থেকে চাদরটা তুলে নিয়ে ভাঁজ করতে লাগল। ডাক্তার চ্যাটার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, চাদরটা ভাঁজ করছ কেন?

আপনার জন্যে আসন তৈরি করছি।

না, থাক্। আমি আর বসব না। মালবিকা, মনে হচ্ছে তোমার ভবিষ্যৎ আর অনিশ্চিত নয়। কোথায় কিছু একটা পেয়েছ ব'লে সন্দেহ করছি।

সন্দেহ নয়, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আজ সমস্তটা দিন চেষ্টা ক'রে ওঁর ছোট ভাই অনিলকে খুঁজে বার করেছি। ছেলেটি বড্ড ভাল। দাদার কথা শুনে তার সে কি কান্না! কোন্ এক বড়লোকের ছেলেকে পড়ায়। মাইনে কিছু পায় না, সেখানে কেবল খায় আর থাকে। এক্ষুনি সে এসে পড়বে।

সে এসে পড়লেই কি তোমার সমস্যার সমাধান হবে মালবিকা? সমস্তটা জীবন কি নিয়ে থাকবে?

তার জবাবটা বোধ হয় আপনিই দিতে পারবেন ডাক্তার চ্যাটার্জি। আপনি পরীক্ষা ক'রে দেখুন। আমার বোধ হয়—

ডাক্তার রামতনু চ্যাটার্জির মুখে ভেসে উঠল প্রফেশনাল হাসি।

সামনের দরজাটা তিনি নিজেই দিলেন বন্ধ ক'রে। মালবিকা শুয়ে পড়ল বিছানায়। মিনিট দশেক ধ'রে ডাক্তার রামতনু চ্যাটার্জি পরীক্ষা করলেন মালবিকাকে। অভিজ্ঞ ডাক্তার পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করলেন নির্ভুল-ভাবে। তিনি নিজেই গিয়ে এবার দরজাটা খুলে দিয়ে এলেন। প্রফেশনাল হাসিতে মুখ তাঁর উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তিনি যেন অপেক্ষা করতে লাগলেন ভিজিট নেওয়ার জন্যে। ভিজিটের একটা টাকাও ছেড়ে না-দেবার ভঙ্গী লেগে রইল হাসির গায়ে।

মালবিকাও গুনে গুনে টাকা তুলে দিল ডাক্তার চ্যাটার্জির হাতে। দিয়ে বললে, কাল সকালেই অনিলকে সঙ্গে নিয়ে শিলং যেতে চাই। আমার পক্ষে শিলংয়ের আবহাওয়া ভাল হবে তো?

খুব ভাল হবে মিসেস রক্ষিত। সেখানকার বড় ডাক্তার সুধীন গুপ্ত আমার বিশেষ বন্ধু। আমার নাম তাঁর কাছে মেনশন করবেন। সে বিশেষ যত্ন নিয়ে দেখাশোনা করবে। চিয়ার ইউ—

ডাক্তার চ্যাটার্জি লিফ্‌টের জন্যে আর অপেক্ষা করলেন না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন ধীরে ধীরে। ভাবতে লাগলেন, জীবনের এই পনেরোটা দিন তিনি সরিয়ে রাখবেন একেবারে আলাদা ক'রে। তিনি মনে মনে এক রকম স্থির ক'রেই রাখলেন যে, পৃথিবী থেকে যেদিন তিনি বিদায় নেবেন, সেদিন তাঁর ঘরে আর কেউ থাকবে না। থাকবে কেবল এই পনেরোটা দিনের ভিড়।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে মালবিকা দেখলে, স্টিফেন কোর্টের ফটক দিয়ে ডাক্তার চ্যাটার্জির গাড়িখানা বেরিয়ে যাচ্ছে। উল্টো দিক থেকে নতুন একজন তেলেগু আয়া ছোট্ট একটা বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ। ডাক্তার চ্যাটার্জি যেন গাড়িটাকে একটু থামিয়ে চেয়ে রইলেন বাচ্চাটার দিকে। তার পর গাড়ির গিয়ার টানলেন ডাক্তার রামতনু চ্যাটার্জি।

ব্ল্যাক-বোর্ডের ওপর মালবিকা আজ কেবল একটাই সাদা অক্ষর দেখতে পাচ্ছে। ছোট্ট তুলতুলে একটা মাংসপিণ্ডের মত সেই সাদা অক্ষরটার বয়েস হয়েছে চার মাস। মালবিকার ভবিষ্যৎ সৃষ্টি ক'রে গেছে সুনীল রক্ষিত নিজেই।

'শনিবারের চিঠি'
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১

অসত্য শহর

সেবকবৈদ্য স্ট্রীটের একটা ম্যানসনের দোতলার ফ্ল্যাটে কুমারী সুচিত্রা সেন পায়চারি করছিলেন। ঘরখানার আয়তন এক শো ষাট বর্গ ফুট। রাস্তার দিকে একটা জানলা আর ওপাশের বাড়ির দিকেও একটা জানলা আছে। ওপাশের বাড়িতে কোটিপতি মধুবাবু রাত দুটোর পর বাতি নিবিয়ে দিয়ে কুমারী সুচিত্রা সেনের ঘরের দিকে চেয়ে থাকেন ব'লে ওদিকের জানলাটা বন্ধ রাখতে হয়। তাতে এদিকের বাতাস ওদিক দিয়ে যাতায়াত করতে পারে না। ফলে তাঁর স্বাস্থ্যসৌধ হরপ্পার মত প্রাচীন ও পতনশীল হয়ে উঠছে। টেবিলের ওপরে অনেকগুলো বই এলোমেলো ভাবে প'ড়ে রয়েছে। নানান বিজ্ঞানের মোটা মোটা ইংরেজী বই। কুমারী সুচিত্রা সেন কলকাতার এক মেয়ে-ইস্কুলের ভূগোলের টীচার।

রাত দুটো পর্যন্ত তাঁর কোনদিনই ঘুম আসে না। আজও আসে নি। টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন, হাত দিয়ে অ্যাসপিরিনের শিশিটা নাড়াচাড়া করতে লাগলেন তিনি। দু ঘণ্টা ঘুমের জন্যে প্রতিদিন তাঁকে চার আনা ক'রে খরচ করতে হয়। কেবল তাই নয়। ভোরবেলা বিছানায় শুয়েই তিনি বড় চামচের দু চামচ ফ্রুট-সল্ট খেয়ে ফেলেন, মোক্ষদা গরম জলের গেলাস নিয়ে মশারির পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাত খাওয়ার আগে এক দাগ লিভার মিক্সচার খেয়ে উঠেই দুটো হজমি বড়ি তাঁকে গিলে ফেলতে হয়। ভূগোল পড়াতে পড়াতে একগাদা ছাত্রীর সামনেই তিনি কাশতে আরম্ভ করেন। তার পর একটা চ্যাপ্টা কৌটো থেকে প্যাস্টিল বার ক'রে কণ্ঠনালীর আশেপাশে জিভ দিয়ে প্যাস্টিল-নিঃসৃত রস লাগাতে থাকেন।

বিকেলের দিকে তাঁর বোধ হয় একটু একটু জ্বরও হয়। সেই জন্যে সপ্তাহে দুবার ক'রে ইন্‌জেকশন নিতে হয়। তার পর কলকাতায় এপিডেমিক তো

লেগেই আছে। আগে এপিডেমিকের একটা সিজিন ছিল; আজকাল যখন-তখন কলেরা বসন্ত হচ্ছে। এর ওপর বিহার থেকে আমরা মানভূম সিংভূম পেলুম না, পেলুম গুটিকয়েক প্লেগ-বাহী ইঁদুর। অতএব কলেরা-বসন্তের প্রতিষেধকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে প্লেগের ইন্‌জেকশনও নিতে হয়।

কুমারী সুচিত্রা সেনের গোটা অস্তিত্বটাই বৈজ্ঞানিক সতর্কতার কাঁটাতার দিয়ে সুরক্ষিত। মিনিট গুনে গুনে তিনি ঘণ্টা কাটান, ঘণ্টা গুনে দিন।

মাঝে মাঝে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে—অনেক রকমের প্রশ্ন। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান সামান্য সর্দিকাশির গোড়া মারতে পারল না, অথচ আণবিক বোমার বাহাদুরি দেখাচ্ছে বিকিনি দ্বীপের ওপর! আণবিক বোমার পরীক্ষাটা কলেরা বসন্ত কিংবা ক্যান্‌সারের ওপর করলেই তো হ'ত? কুমারী সুচিত্রা সেন নিজের মনেই প্রশ্নটা করলেন, আর সেই সময় চেয়ে রইলেন দেয়ালে টাঙানো মানচিত্রের দিকে। শীর্ণ এবং রক্তশূন্য লম্বা আঙুলটা দিয়ে তিনি মানচিত্রের ওপরেই ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম ক'রে সাগর ও মহাসাগর পার হতে লাগলেন। ভূগোলের শিক্ষয়িত্রী তিনি, বিকিনি দ্বীপের সঠিক অবস্থান না জানলে তাঁর জ্ঞানের অভাব ধরা পড়বে।

টুং ক'রে সেবকবৈদ্য স্ট্রীটে রিক্‌শা চলার আওয়াজ হ'ল। কুমারী সুচিত্রা সেন প্রতিদিনই রাত দুটোর সময় রিক্‌শা চলার আওয়াজ পান। আওয়াজটা তাঁর মধ্যরাত্রির সঙ্গী। আওয়াজটা না শুনলে তিনি যেন হাঁপিয়ে ওঠেন, তাঁর মধ্যরাত্রির সঙ্গীবিরহিত জীবন অসহ্য মনে হয়। আজও শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুটে এলেন জানলার কাছে।

রিক্‌শাওয়ালাও রাত জাগছে। কুমারী সুচিত্রা সেন আর একা নন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রিক্‌শাওয়ালাও জেগে আছে। বৈজ্ঞানিক মানুষের কাছে রাত আর দিনের মধ্যে কোন তফাতই নেই—এমন কি, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে ঘুমের প্রয়োজন তাও আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার করে না। তিনি দেখলেন, রিক্‌শাওয়ালা একটা গামছা কোমরে জড়াচ্ছে। কোমরটা ওর এত সরু যে হাওড়া হাটের চোদ্দ

পয়সার গামছা দিয়ে ও-রকম দুটো কোমরই জড়িয়ে ফেলা যায়। রিকৃশাওয়ালা দেহে তাগদ রাখে। মানচিত্র-দেখা চোখ দিয়ে তিনি রিকৃশাওয়ালার গোটা জীবনটাই যেন দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এক ভদ্রলোক রোজই আসেন রাত দুটোর সময়। রিকৃশাওয়ালার শেষ সওয়ারী। আসেন তিনি হাজরা লেনের দিক থেকে। মোড়ে এসে একটু বিশ্রাম করেন তিনি। তার পর রিকৃশায় চেপে একটা বিড়ি ধরিয়ে আদেশ দেন, চলো। মাতাল? কুমারী স্থচিত্রা সেন জানেন, মাতাল কখনও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তার পা কাঁপবেই। কিন্তু ভদ্রলোকটির পা কখনও কাঁপে না। ভদ্রলোকটি চ'লে যাওয়ার পর তাঁর নিদ্রাহীনতার মানসিক কষ্ট হ্রাস পায়। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকটিও যেন রাত জাগছেন—এই কথা ভেবে তিনি পুনরায় ফিরে আসেন টেবিলের কাছে।[১]

ডান দিকের দেওয়ালে একটা তাক আছে। তাতে সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস সব সাজানো থাকে। সরষের তেল, কিছু মসলা, ডাল এবং ছোটখাট আরও কটা জিনিস তিনি টিনে ভর্তি ক'রে সাজিয়ে রেখেছেন। মাইনে পেয়ে প্রতি মাসে তাঁর ডাল-মসলা কিনতে হয় না। আড়াই সের ডাল কিনলে তিন মাস তাঁর খেয়ে এবং না-খেয়ে বেশ চ'লে যায়। কুমারী স্থচিত্রা সেনের মুখে স্বাদের কোন বালাই নেই। পেটে নেই ক্ষিধের জ্বালা। ট্যাবলেট আর ইন্‌জেকশনের জোরে তিনি কোনরকমে ইস্কুলে ভূগোল পড়িয়ে সেবকবৈদ্য স্ট্রীটে ফিরে আসেন। খাওয়ার বর্বরতা কেবল মোক্ষদারই আছে। সেই জন্যেই সে নিজের ইচ্ছেমত রান্না করে, পেট ভ'রে ভাত খায়, রাত্রিবেলা টানা আট ঘণ্টা ঘুমোয়।

মোক্ষদার ওপর তাঁর মাঝে মাঝে রাগ হয়। কেবল মোক্ষদার ওপর নয়, যারা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আট ঘণ্টাই ঘুমিয়ে কাটায় তাদের প্রত্যেকের ওপর। সভ্য মানুষের সামনে কত সমস্যা, কত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ, কত মীমাংসার কাজ রয়েছে। আট ঘণ্টা ঘুমিয়ে নষ্ট করলে এদের

বর্বরতা ঘুচবে কি ক'রে? প্রাগৈতিহাসিক মোক্ষদারা কেমন ক'রে যে ঘুমের অন্ধকারে আছে, ভেবে তিনি খুবই আশ্চর্য বোধ করলেন। যে যুগে ঐশী প্রত্যাদেশের অকর্মণ্য ভাবপ্রবণতা ছিল, সে-যুগের চব্বিশ ঘণ্টার দীর্ঘতা আজকে চব্বিশ মিনিটের বেশি নয়।

সময়ের হিসেবটা ঠিক হওয়ার পর এবার তাঁর দৃষ্টি পড়ল ঘিয়ের টিনের ওপর। ভেজিটেবল ঘি। খাঁটি ও অকৃত্রিম গব্য ঘৃতের কথা ভাবতে গেলে যেন বেদবেদান্তের যুগেই ফিরে যেতে হয়। শোনা যায়, প্রাচীন ভারতে খাঁটি গাওয়া ঘি পাওয়া যেত ব'লেই সবল ও অকর্মণ্য আর্যরা উৎফুল্ল মনে বেদবেদান্ত পড়তেও পারত। কুমারী সুচিত্রা সেনের মুখ দিয়ে হঠাৎ একটা ঢেকুর উঠে এল। হজম না হওয়ার ঢেকুর। কুমারী সুচিত্রা সেনের পাকস্থলীতে 'বনস্পতি'র বিপ্লব চলেছে। ধনপাতদের ভেজিটেবল ঘিয়ের কারখানা আছে ব'লে বৈজ্ঞানিকেরা নাকি ফতোয়া দিয়েছেন যে, স্বাস্থ্যরক্ষার একমাত্র উপকরণ ভেজিটেবল ঘি। কলে প্রস্তুত, হাত দিয়ে স্পর্শ করা হয় না। ভূগোলের শিক্ষয়িত্রীর মুখে রাত ছুটোর সময়েও হাসি এল। ধনপতিদের শোষণ-লিপ্সায় নতুন ক'রে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান রচিত হচ্ছে!

রিকৃশাওয়ালা চ'লে যাওয়ার পর তিনি চারটে অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট খেয়ে বাতিটা নিবিয়ে দিলেন। স্নায়ুতন্ত্র অবশ হয়ে এলেই ঘুম আসবে। এবার তিনি ওপাশের জানলাটা খুলে দিলেন। কোটিপতি মধুবাবু সারারাত ধ'রে চেষ্টা করলেও ওঁকে আর দেখতে পাবেন না। পাকস্থলী প'চে গেলেও কুমারীত্ব তাঁর বাঁচিয়ে চলতেই হবে। যে দীর্ঘ সময় তাঁর জীবন থেকে খ'সে গেছে, তা আর ফিরে আসবে না। যেটুকু সময়ের মূলধন তাঁর হাতে আছে, তা থেকে আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে ভাগ-বখরা দিয়ে খরচ করা চলবে না। সময় বড় সংক্ষিপ্ত। তা ছাড়া মানুষ তাঁর কাছে আসবেই বা কেন? তাঁর বিদগ্ধ জীবনের চারপাশে কেবল বিজ্ঞানের তিক্ততা আছে, ভালবাসার মধু নেই। অতএব প্রকোষ্ঠ তাঁর নির্মক্ষিক।

কুমারী সুচিত্রা সেনের একটা অতীত ছিল। আধুনিক মানুষদের অতীতের মত তা স্মরণযোগ্য নয়। এযাবৎকাল যাঁরা বর্তমানকে অতীতের একটা বর্ধিত অংশ ব'লে মনে ক'রে এসেছেন, তাঁরা ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন। প্রাগৈতিহাসিক মোক্ষদার ন্যূনতম অংশও পাওয়া যাবে না কুমারী সুচিত্রা সেনের মধ্যে। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ বর্তমানের মত অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন।

বিচ্ছিন্ন হ'লেও তাঁর পিতা-পিতামহের নাম-ঠিকানা একটা ছিল। বিশ বছর আগে বিধবা মার মৃত্যুর পর কুমারী সুচিত্রা সেন চ'লে আসেন কলকাতায়। অতীতের অংশটাকে কেটে রেখে এলেন সেনহাটি গ্রামে। কোন্ এক মামা না পিসেমশাইয়ের কলকাতার বাড়িতে থালাবাসন মেজে তিনি বি. এ. পাস করলেন। বি. এ. পাস করবার পর চাকরি পেলেন একটা মেয়ে-ইস্কুলে। পঞ্চাশ টাকা থেকে মাইনে বাড়তে বাড়তে তাঁর মাসিক আয় দাঁড়াল এক শো পঁচাত্তর টাকা। সেবকবৈদ্য স্ট্রীটের এক-ঘরের ফ্ল্যাটে তিনি উঠে এসেছেন এগারো বছর আগেই। মামা বা পিসেমশাইয়ের বাড়ির অতীত তিনি সযত্নে তাঁদের কাছেই ফেলে এলেন, কেবল বর্তমানকে তাঁর বিচ্ছিন্ন ক'রে নেওয়ার জন্যে। সাহায্য যা তিনি পেয়েছিলেন, তার বিনিময়ে তিনি দিয়ে এসেছেন তাঁর বাসনমাজার অনাদায়ী পারিশ্রমিক। অর্থশাস্ত্রের আদান-প্রদানের নিয়মানুসারে কেউ কোন দিক থেকে এক পয়সাও ঠকলেন না।

আজ যেন তাঁর মনে হ'ল, নির্মক্ষিক প্রকোষ্ঠে দু-এক ফোঁটা মধুর সন্ধান থাকলে মন্দ হ'ত না। মধু? মানে, ভালবাসার মধু। ঠিকানাহীন লক্ষ লক্ষ আধুনিক মানুষের মত তিনিও যেন ফ্ল্যাট বাড়িতে আত্মগোপন ক'রে আছেন—ইট-সুরকির মধ্যে তিনি বোধ হয় আশ্রয় পান নি। ইট-সুরকির মধ্যে আর যাই থাক্, মধু নিশ্চয়ই নেই। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষা, তিনি চেয়েছিলেন মাইনে। দুটোই তিনি পেয়েছেন। গত এগারো বছর থেকে তিনি মাইনে আর মাগ্‌গী ভাতা নিয়ে ঘরে ফিরে আসেন—সেবকবৈদ্য স্ট্রীটের

ঘরে, যার আয়তন এক শো ষাট বর্গ ফুট। এধারে ফাঁকা রাস্তা, ওধারে মধুবাবুর ঘর। এরই মাঝখানে তিনি পায়চারি করেন। স্বয়ংসম্পূর্ণ বর্তমানের গর্ব তাঁর অনেক। গর্ব তাঁর নিজের কুমারীত্বের কঠিন তপস্যায়, গর্ব তাঁর চারিত্রিক পরিশুদ্ধতায়। তিনি জিতেছেন। কিন্তু কার কাছে জিতলেন ? প্রতিপক্ষ কে ?

ইস্কুলের কমন-রুমে ব'সে কুমারী সুচিত্রা সেন নিজের কাছেই নিজে প্রশ্ন দুটো উত্থাপন করলেন। সামনের চেয়ারে ব'সে অঙ্কের টীচার সুকুমারী দত্ত তাঁর বাচ্চা ছেলের জন্যে উলের জামা বুনছিলেন। কুমারী সুচিত্রা সেন মনে মনে বিরক্ত বোধ করতে লাগলেন। ইস্কুলটা তো জামা বোনবার জায়গা নয় ? সুকুমারী দত্ত কি জানেন না, এসব জামা-কাপড়ের জন্যে আলাদা দোকান আছে, বোনবার জন্যে আছে আলাদা লোক ? একটু পরে এলেন ইংরেজীর শিক্ষয়িত্রী মিস মীরা গুপ্ত। তিনি এসেই ঘোষণা করলেন, আবার একটা স্ক্যাণ্ডাল হ'ল ! আমাদের সিনিয়র টীচার মিস ঘোষ বিয়ে করতে যাচ্ছেন।

উলের জামা বুনতে বুনতে সুকুমারী দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, তাতে তোমার এত আপত্তি কেন মীরা ?

মিস ঘোষ তো আর জীববিদ্যা চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারেন না ? ষাট বছর বয়সে তিনি কি প্রমাণ করতে যাচ্ছেন ?

কেবল কোন কিছু প্রমাণ করবার জন্যেই কি আমরা বেঁচে আছি ? মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মার আত্মীয়তা সব বন্ধ ক'রে দেবে নাকি মীরা ?

প্রায় দু মণ ওজনের মেদমজ্জার স্তূপ নিয়ে মিস মীরা গুপ্ত ধপাস ক'রে ব'সে পড়লেন একটা কাঁঠাল কাঠের চেয়ারে। তারপর তিনি বললেন, মিস ঘোষের শরীরে আত্মা আছে ব'লে আমি জানতুম না। থাকার মধ্যে আছে তো বাত। কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত কেবল বাতের ব্যথা, আর—

বাধা দিয়ে সুকুমারী দত্ত বললেন, বিয়ের পর ব্যথা-বেদনা সব সেরে যাবে।

মিস গুপ্ত চেঁচিয়ে উঠলেন, কেন ? আপনি কোন ওষুধের সন্ধান পেয়েছেন নাকি ?

পেয়েছি। তোমরা নামটা সবাই লিখে নাও। কুমারী সুচিত্রা সেনের বাতের ব্যথা নেই বটে, তবুও তিনি ভবিষ্যতের কথা ভেবেই বোধ হয় কাগজ-কলম নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এমন সময় সুকুমারী দত্ত বললেন, ভালবাসার ওষুধ ছাড়া এ যুগের মানুষ ব্যাধিমুক্ত হতে পারবে না মীরা। যন্ত্রগুলোও চলে, তাদেরও মাঝে মাঝে তেল-গ্রীজ চাই।

কুমারী সুচিত্রা সেন ব্যাগ থেকে দুটো ভাইটামিন ট্যাবলেট নিয়ে খেয়ে ফেললেন। ইস্কুল-ছুটির সময় হয়েছে। ট্যাবলেট দুটো না খেয়ে তিনি কলকাতার ট্রামে-বাসে যাতায়াত করতে পারেন না।

মিস মীরা গুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার সর্বরোগনাশক ওষুধটি বোধ হয় স্বপ্নে পাওয়া ? দিন না তবে সুচিত্রার পচা পাকস্থলী আর ফুসফুসের ব্যাধি সারিয়ে।

সারবে বইকি, নিশ্চয়ই সারবে। একবার চেষ্টা করতে অসুবিধে কি ?

অসুবিধে আছে বইকি মিসেস দত্ত। জীববিদ্যার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে আমরা মূর্খতার সংস্কার দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারি না। মিলন হবে প্রজাতির সঙ্গে প্রজাতির—মানুষ তো উপলক্ষ্য মাত্র।

মীরা, মানুষ যদি মানুষকে ভালবাসতে না পারল, তবে তোমার জীববিদ্যার গোটা বিজ্ঞানটাই একদিন বনে-জঙ্গলে পরিত্যক্ত হবে।

একটু থেমে সুকুমারী দত্ত পুনরায় প্রশ্ন করলেন, স্নেহ, প্রেম, ভালবাসাও কি বিজ্ঞানের সাহায্যে পাওয়া যায় ?

যায়। ইন্‌জেকশন নিতে হবে। ইন্‌জেকশনের জোরে আমরা পান্তাবুড়ীকেও আজ যুবতী করতে পারি।

কিন্তু তুমি তো তোমার বয়স কমাতে পারছ না মীরা ? পান্তাবুড়ীর সঙ্গে তোমার দেখছি অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে।—একটু হেসে সুকুমারী দত্ত ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। বাড়ি গিয়ে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে হবে, স্বামী হয়তো এতক্ষণে অফিস থেকে ফিরে এসেছেন, তাঁরও জলখাবার চাই। তিনি আর অপেক্ষা করতে পারলেন না।

আজ কদিন থেকে কুমারী সুচিত্রা সেন ঘরের মধ্যে ক্রমাগত পায়চারি ক'রে চলেছেন। তিনি বিয়ের কথাই ভাবছিলেন। বিয়ের কথা ভাবতে গিয়ে তাঁর সমাজের কথা মনে পড়ল। সমাজ? তিনি জানেন, কলকাতায় কতগুলো রোড, স্ট্রীট আর লেন আছে—সমাজ নেই। তিনি স্মরণ করলেন সেনহাটির কথা। সেনহাটিতেও সমাজ বোধ হয় একটা ছিল। কেবল সমাজ হ'লেই চলবে না, তাঁর নিজের একটা পাকা ঠিকানা চাই। ঠিকানার আগে চাই পিতৃপরিচয়। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ তিনি জানলার গরাদে ধ'রে দাঁড়িয়ে গেলেন। স্বর্গীয় পিতার নাম তাঁর মনে পড়েছে। গত বিশ বছরের ভগ্নস্তূপ থেকে তিনি একটা পরিচয় উদ্ধার ক'রে নিয়ে এলেন। কিন্তু ঠিকানা? সেনহাটিতে তাঁর কিছু নেই। কোন আত্মীয়স্বজনের নাম তাঁর মনে পড়ল না। শেষ পর্যন্ত তিনি ভাবলেন, বিয়ে তো হবে তিনতলার ছাদে, তবে তাঁর সেনহাটিতে ঠিকানা খুঁজে লাভ কি? তিনি পায়চারি করতে লাগলেন আর বিয়ের কথা ভাবতে লাগলেন। আজ আর তাঁর জীববিদ্যার কথা মনে পড়ল না। হাই-ইস্কুলও ক্রমশ আবছা হয়ে আসতে লাগল। কেবল মনে পড়তে লাগল সুকুমারী দত্তের হাতে সেই উলের জামাটা। শীত প্রায় এসে গেল, উলের জামাটা তাঁর আজও শেষ হয় নি। বাচ্চাটা নিশ্চয়ই মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে চলাফেরা করে। কে জানে, হয়তো মিসেস দত্তের অসাবধানতার জন্যে বাচ্চার ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

হঠাৎ তিনি চাইলেন রাস্তার দিকে। রাত দুটো বেজে গেল, অথচ রিকৃশাওয়ালাটা আজ আর মোড়ে এসে অপেক্ষা করছে না তার শেষ সওয়ারীর জন্যে। তিনি খুবই বিস্ময় বোধ করতে লাগলেন। কেবল বিস্ময় নয়, তাঁর সঙ্গীহীন জীবনের বেদনা বাড়তে লাগল প্রতি মুহূর্তে। তিনি একা! তিনি ভেঙে পড়ছেন। অ্যাসপিরিনের শিশিটা হাতে নিয়ে সামনের দিকে চাইতেই তিনি দেখলেন যে, ভদ্রলোকটি চারদিকে চেয়ে চেয়ে রিকৃশাটাকে খুঁজছেন। আধুনিক মানুষের ঠিকানার যখন কোন স্থায়িত্বই নেই, তখন রিকৃশাওয়ালাই

বা প্রতিদিন সেবকবৈদ্য স্ট্রীটে অপেক্ষা করবে কেন? কুমারী স্থচিত্রা সেন অ্যাসপিরিনের শিশিটা হাতে নিয়েই এসব আধুনিক কথাগুলো ভাবছিলেন। ভাবছিলেন বটে, কিন্তু চেয়ে ছিলেন ভদ্রলোকটির দিকেই। এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে ভদ্রলোকটি স'রে এলেন জানলার দিকে। অকস্মাৎ দুর্ঘটনা ঘটল। কুমারী স্থচিত্রা সেনের হাত থেকে শিশিটা প'ড়ে গেল সামনের রাস্তায়। আর পড়ল বোধ হয় ভদ্রলোকটির মাথায়। শিলংয়ের পাহাড়ে দুর্ঘটনা যা ঘটেছিল, তা তো গাড়ির সঙ্গে গাড়ির, তাতে অমিত রায়ের রোমাণ্টিক বেলুনটা কেবল একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠেছিল, ফাটে নি। কিন্তু সেবকবৈদ্য স্ট্রীটে ভদ্রলোকটির বোধ হয় আঘাতই লাগল। টিংচার আয়োডিনের একটা নতুন শিশি হাতে নিয়ে কুমারী স্থচিত্রা সেন তরতর ক'রে নেমে এলেন একতলায়। এক শো ষাট বর্গ ফুটের সীমাবদ্ধতায় জীবনের স্পন্দন এল।

দু সপ্তাহ পর কুমারী স্থচিত্রা সেন এলেন ইস্কুলের হেড-মিস্ট্রেস মিস দীপ্তি মিত্রের ঘরে। এক মাসের ছুটি চাই তাঁর।

ছুটি? কেন?—জানতে চাইলেন মিস মিত্র।

পরশুদিন আমার বিয়ে।

বিয়ে? মানে, ওই যে কি ব'লে—ইউ মীন, মেয়ে-পুরুষে মিলে ওই যে কি সব বিয়ে-টিয়ে হয়, সেই রকম?

আজ্ঞে হ্যাঁ। পরশু রাত আটটায় লগ্ন। আপনি আসবেন কিন্তু।

মিস দীপ্তি মিত্র খড়িমাটি-মাখা ডাস্টার দিয়ে নিজের চশমার কাঁচ পরিষ্কার করতে লাগলেন। তারপর বললেন, পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমারও একবার বিয়ের লগ্ন এসেছিল স্থচিত্রা।

বিয়ে হয় নি বুঝি?

হয়েছিল। কিন্তু সাত দিন পর লোকটা পালিয়ে যায়।

কেন?

লোকটার নাকি আরও তিনটে বউ ছিল। সুচিত্রা, তোমার মধ্যে শিক্ষা আছে, কৃষ্টি আছে, কিন্তু স্বাস্থ্য নেই। অতএব পুরুষ-মানুষকে বিশ্বাস ক'রো না। ধুতি-পাঞ্জাবি পরলেই মানুষ পুরুষ-মানুষ হয় না।

এখন আর উপায় নেই। বিয়ের চিঠি ছাপানো হয়ে গেছে।

বিয়ে তো ছাপাখানায় হয় না সুচিত্রা। বিয়ে হয় মনের সঙ্গে মনের, দেহের সঙ্গে দেহের। তোমার এই দুটো জিনিসেরই অভাব। তা সত্ত্বেও এক মাসের ছুটি তোমায় আমি দিলুম। রাঁচি থেকে বেড়িয়ে এসো, হজমশক্তি বাড়বে। আমি প্রতি বছরই একবার ক'রে যাই।

বিয়ের চিঠি কখানা হাতে নিয়ে কুমারী সুচিত্রা সেন হাঁটতে লাগলেন কমন-রুমের দিকে। মানুষের জীবনে ত্রিশ বছরই শেষ বছর নয়। তবু আজ তাঁর কাছে ত্রিশ বছরের বোঝাটা যেন খুবই ভারী ব'লে মনে হ'ল। কেউ যেন তাঁকে ভুল সংশোধনের সুযোগ দিতে চায় না। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার জন্যে তাঁর সব আয়োজন এঁরা ব্যর্থ ক'রে দিতে চান। কিন্তু তিনি পরাজয় স্বীকার করবেন না। সঙ্গী তাঁর চাই।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে মিস মীরা গুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্রলোকটির পদবী কি? থাকেন কোথায়?

আমার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে কলেজ স্ট্রীটের অম্বিকাবাবুর। তাঁর পদবী কিংবা ঠিকানার সঙ্গে নয়। তিনি পুরুষমানুষ, সেইটে জানাই কি আমার কাছে যথেষ্ট নয় মিস গুপ্ত?

বোধ হয় নয়। বৈজ্ঞানিক মতে একবার পরীক্ষা করিয়ে নিয়ো।

মিস গুপ্তের বিজ্ঞানপ্রীতির প্রতি সশ্রদ্ধ নিবেদন জানিয়ে কুমারী সুচিত্রা সেন বললেন, লগ্ন আটটায়। ট্রামে চেপেই আবার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারবেন।

বিয়ের দিন সন্ধ্যে সাতটার সময় কলেজ স্ট্রীটের অম্বিকাবাবুর মনে পড়ল,

রাত আটটায় তাঁর বিয়ের লগ্ন। সাত দিন পূর্বে তিনি বিয়ের বাবদ পাঁচ শো টাকা আগাম পেয়েছিলেন শিক্ষয়িত্রীর কাছ থেকে। উপস্থিত পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন যে, পাঁচ শো টাকার মধ্যে মাত্র পাঁচ টাকা অবশিষ্ট আছে। তিনি চললেন এক সস্তার গলিতে। ক্যানিং স্ট্রীটের দালালবন্ধু বটকেষ্ট পালকে খুঁজে বার করতে হবে। তাঁর কাছে গোটা পঞ্চাশ টাকা ধার নিলেই বিয়ের রাতটা পার ক'রে দিতে অসুবিধে হবে না। ধার ফেরত দেওয়ার বন্দোবস্ত তিনি মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছেন।

বটকেষ্টকে খুঁজে বার করলেন তিনি। পঞ্চাশ টাকা ধার পাওয়ার পর তিনি বললেন, দেখ্ বটকেষ্ট, পাঁচ শো টাকার লক্ষ্মী যখন এল, তখন পরিষ্কার দেখলুম। কিন্তু লক্ষ্মী যখন পালিয়ে গেল, তখন কিছুই দেখতে পেলুম না।

চোখ রগড়ে বটকেষ্ট পাল বললেন, গলির এ মাথা থেকে সে মাথা পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করলে কেউ দেখতে পায় না। লক্ষ্মী বড্ড পিছ্‌লে দেবতা। বুঝলি অম্বিকে ?

অম্বিকাবাবু বুঝলেন কি না জানা গেল না। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে চ'লে এলেন কলেজ স্কোয়ারের সামনে। দোকান থেকে জামা, ধুতি ও জুতো কিনলেন অম্বিকাবাবু। কিন্তু পরবেন কোথায় ? ঢুকে পড়লেন কলেজ স্কোয়ারেই। তারপর ময়লা কাপড়গুলো রাখবার জন্যে একটা নির্ভরযোগ্য ঠিকানাও পাওয়া গেল, স্টীম লন্‌ড্রি। কলেজ স্ট্রীটের অম্বিকাবাবু বটকেষ্টকে সঙ্গে নিয়ে চললেন বিয়ে করতে ক্যালকাটা ট্রাম কোম্পানির প্রথম শ্রেণীতে চেপে।

রাত আটটা বাজতে মাত্র পনরো মিনিট বাকি। সেবকবৈদ্য স্ট্রীটের তিন-তলার ছাদে কলরব উঠল, বর কি তবে আসবেন না ? না এলেই যেন মিস মীরা গুপ্তের ঈর্ষাকাতর মনে শান্তি ফিরে আসে। কলেজ স্ট্রীটের অম্বিকাবাবু মিস মীরা গুপ্তকে নিরাশ ক'রে দিয়ে তিনতলায় উঠতে লাগলেন। পেছন থেকে বটকেষ্ট পাল জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে অম্বিকে, পা কাঁপছে না কি ?

পা কাঁপছে না, বুক কাঁপছে। ফুসফুসের তো কিছুই নেই।

প্রেম ক'রে বিয়ে করছিস, ফুসফুসের দরকার হবে না। ভয় নেই, এগিয়ে যা।

অম্বিকাবাবু এগিয়ে গেলেন। তিনতলার একেবারে ওপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে মুখটা তিনি বাড়িয়ে দিলেন ছাদের দিকে। দেখতে পেয়েই মিস মীরা গুপ্ত কর্কশকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন, বর এসেছে। উলু দাও, উলু দাও।

সবাই কলরব করতে লাগলেন, উলু কেউ দিতে পারলেন না। সেবকবৈদ্য স্ট্রীটের তিনতলার ছাদে কুমারী সুচিত্রা সেনের বিয়ে হয়ে গেল রাত আটটার লগ্নে।

পরের দিন কালরাত্রি। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর অম্বিকাবাবু বললেন, বাইরে যাচ্ছি, ফিরতে রাত হবে।

তিনি অবশ্য রাত্রে আর ফেরেন নি, ফিরলেন পরের দিন ভোরবেলা।

আজ ওঁদের ফুলশয্যা।

বেলা দশটার সময় অম্বিকাবাবু বললেন, শ খানেক টাকা দাও। দু-চারটে শাড়ি-ব্লাউজ কিনতে হবে।

সুচিত্রা দেবী নিঃশব্দে স্বামীর হাতে একটা এক শো টাকার নোট তুলে দিলেন। অম্বিকাবাবু বাঁ হাত দিয়ে শ টাকার নোটখানা তুলে ধরলেন ওপরের দিকে। তারপর ডান হাতের আঙুল দিয়ে তিন-চারবার টোকা মারলেন। নাকের কাছে নোটখানা ধ'রে অম্বিকাবাবু বললেন, নতুন কাগজ, তাই গন্ধ ছাড়ছে। এসব জিনিস ধ'রেও সুখ, শুঁকেও সুখ। কি বল?

সুচিত্রা দেবী কিছুই বললেন না। ব'লে কোন লাভও নেই। তিনি স্বামী চেয়েছিলেন, স্বামী পেয়েছেন। তাঁর পায়ের কাছে জীবনটাকে এখন নিবেদন ক'রে দিতে পারলেই তিনি বেঁচে যান। মোক্ষদার মত আট ঘণ্টা ঘুমোতে পারলেই তাঁর সমস্যার সমাধান হয়।

অম্বিকাবাবু অতঃপর একটা পরিচিত হিন্দী গানের প্রথম লাইনটা শিস দিতে দিতে নেমে গেলেন একতলায়। সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে তিনি স্বর ক'রে বললেন, তুমি লয়লা, আমি মজনু। হেসে ফেললেন স্থচিত্রা দেবী। নির্ভরতার হাসি। বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র পার হয়ে বন্দরে পৌছবার হাসি।

রাত আটটা বাজল, অম্বিকাবাবু ফিরলেন না।

ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে লাগল নটা থেকে দশটা, দশটা থেকে এগারোটা। তিনি এ-জানলায় ও-জানলায় উঁকি দিতে লাগলেন। প্রথমে পাঁচ মিনিট পর পর, শেষে এক মিনিট পর পর চলল তাঁর উঁকি দেওয়া। অন্বেষণের গভীরতা বাড়তে লাগল তাঁর। স্থচিত্রা দেবী পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন। আর তিনি পায়চারি করতে পারছেন না। বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। ঘরের দরজা খোলা রইল।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন স্থচিত্রা দেবী: সেনহাটির অতীতটাকে কোনরকমে উদ্ধার করা যায় কি না? ফিরে যাওয়া যায় কি সেখানে? প্রতিবেশীকে ভালবাসবেন তিনি, ভালবাসবেন সেনহাটির আম-কাঁঠালের বাগান, বকুল-কদম বাদ যাবে না কেউ। রায়বাবুদের দীঘির জলে তিনি সাঁতার কাটবেন। অনেক লম্বা দীঘি—কচুরিপানার অনেক বিষ রয়েছে তাতে। থাক্ না বিষ। বিষ দিয়ে তো বিষের ব্যথা ঘোচে! পাকস্থলীতে যে-বিষ জমেছে সেই বিষের বোঝা তিনি নামিয়ে দেবেন রায়বাবুদের দীঘির জলে। স্থচিত্রা দেবী ঘুমিয়ে পড়লেন। অ্যাসপিরিনের ঘুম।

একটু পর তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, কে? কে?

লাফিয়ে উঠলেন তিনি ফুলশয্যা ছেড়ে। জ্বালিয়ে দিলেন বাতি। এক শো ষাট বর্গ ফুটের সীমাবদ্ধতা যেন আরও সঙ্কুচিত হ'ল। তিনি বোধ হয় দম আটকেই মারা যাবেন!

সামনে-দাঁড়ানো লোকটাকে দেখে তিনি লজ্জা পেলেন। কেবল দেহটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে এই তাঁর প্রথম লজ্জা। অসত্য শহরের নেশা যেন তাঁর কাটতে লাগল, মর্‌ফিয়ার নেশা।

তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি। আমি বটকেষ্ট পাল।

বিলম্বিত স্বরে সুচিত্রা দেবী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই আপনার?

এখন বোধ হয় আমি কেবল টাকাটাই ফেরত চাই। অম্বিকা আমার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা ধার নিয়েছিল।

অসত্য শহরে তাঁর নারীত্ব-নিষ্ঠার বিনিময়-মূল্য মাত্র পঞ্চাশ টাকা! এবার সুচিন্তিত সত্যের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন সুচিত্রা দেবী। সত্যকে গ্রহণ করতে হ'লে তাঁকে স'রে যেতে হবে অন্য শহরে, যে-শহরে মর্‌ফিয়ামিশ্রিত সভ্যতা নেই। উপস্থিত তিনি কি করবেন?

অম্বিকাবাবুর ঋণ শোধ দেওয়ার দায়িত্ব কি তাঁর? যদি শোধ না দেন? শোধ না দিলে বটকেষ্ট পালের হিসেবের খাতায় চিরদিন তিনি বন্ধকী বস্তুর মত প'ড়ে থাকবেন অপরের অধিকার-আয়ত্তের মধ্যে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি অম্বিকাবাবুদের গুপ্ত ঋণের বোঝা তিনি কি পারবেন শোধ দিতে? পারবেন না। তা হ'লে তাঁকে থাকতে হবে এই অসত্য শহরেই আত্মগোপন ক'রে। বটকেষ্ট পালদের দৃষ্টি তিনি এড়িয়ে চলতে পারবেন না। ওদের সামনে রেখেই তিনি গত বিশ বছর ধ'রে পান করেছেন জীবনের সহস্র লজ্জা—ক্লিষ্টির বিষপাত্র থেকে।

ড্রয়ার থেকে পঞ্চাশটা টাকা নিয়ে তিনি বটকেষ্ট পালকে দিয়ে দিলেন। একটা রূঢ় কথাও বললেন না তিনি। এমন কি, অভিযোগ-বিক্ষত একটা শব্দও উচ্চারণ করলেন না সুচিত্রা দেবী। জনৈক বটকেষ্ট পালের ঋণ তিনি আজ শোধ করতে পারলেন। ক্রমে ক্রমে হয়তো অসংখ্যের ঋণও শোধ করবেন সুচিত্রা দেবী। তারপর বিশ্বাস ও ভালবাসার রাস্তা ধ'রে একদিন তিনি উপনীত

হবেন সত্য শহরের সিংহদরজায়। বটকেষ্ট পালরা তাঁকে পেছন থেকে প্রণাম জানাবে।

টাকা পাওয়ার পর আজও বটকেষ্ট পাল সুচিত্রা দেবীর পায়ের দিকে হাত বাড়াতে যাচ্ছিলেন। বাধা দিয়ে তিনি বললেন, অন্য একদিন আসবেন, যখন আপনার সুবিধে হয়। আলাপ-পরিচয় করব। আজকের মত সেদিনও আমার দরজা খোলাই থাকবে। নমস্কার।

জানলার গরাদে ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলেন কুমারী সুচিত্রা সেন। রাত দুটো বাজল। চোখে তাঁর জল এল আজ। সমস্ত জীবন ধ'রে তিনি কলকাতার ইট-সুরকির মধ্যে আশ্রয় খুঁজে বেড়িয়েছেন, সঙ্গীহীন জীবনের শূন্যতা ভরাট করতে চেয়েছেন সিমেণ্টের শক্ত মাটি দিয়ে। আজ তাঁর দু ফোঁটা চোখের জলে সিমেণ্টের গাঁথুনি গেল ভেসে! ইচ্ছে হচ্ছিল, তুফানের উন্মত্ত আবেগ নিয়ে জীবনে একবারটি কেবল প্রাণ খুলে কাঁদবেন তিনি। মরফিয়া-মাতাল অবশ মানুষগুলোকে তিনি চোখের জলে ভাসিয়ে দেবেন আজ।

লজ্জা পেলেন কুমারী সুচিত্রা সেন। লজ্জা পেলেন এই ভেবে যে, এ যুগের সভ্য মানুষেরা কাঁদতেও জানে না। ওরা জানে না, বড় সৃষ্টির উৎস রয়েছে বড় কান্নার বুকে। তিনি চোখ বুজলেন। হাত বাড়ালেন জানলার গরাদের মধ্যে দিয়ে—শীর্ণ ও রক্তশূন্য আঙুলগুলো যেন আলোর লোভে ব্যাকুল হয়ে উঠল। তাঁর সমগ্র অস্তিত্বের নীরব সমুদ্রে শুরু হ'ল ব্যথার আলোড়ন, বেদনার প্রলয়। সমুদ্র-মন্থনের উদ্বেল তরঙ্গমালা যেন তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। তবু তিনি চোখ বুজে রইলেন। দৃষ্টিপাত করলেন নিজের অন্তরের দিকে। দেখলেন তিনি, সেখানে সেবকবৈদ্য স্ট্রীট উহ্য হয়ে গেছে, লুপ্ত হয়ে গেছে তাঁর ইস্কুল, হারিয়ে গেছেন কলেজ স্ট্রীটের অম্বিকাবাবু।

অসত্য শহরের সীমাবদ্ধ এলাকার বাইরে এসে দাঁড়ালেন কুমারী সুচিত্রা সেন। সহসা তাঁর মনে হ'ল, সামনের দিক থেকে অম্বিকাবাবু আসছেন।

কলেজ স্ট্রীটের অম্বিকাবাবু এ নয়। তাঁর স্বামী অম্বিকাবাবু আসছেন ভালবাসার মহাসাগর উত্তীর্ণ হয়ে। কুমারী সুচিত্রা সেন সঙ্গী পেলেন।

মধুবাবু কিংবা বটকেষ্ট পালদের আর তিনি ভয় করবেন না। ওধারের জানলাটা খুলে দিলেন তিনি। খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন মধুবাবুর ছায়া। কোটিপতি মধুবাবু আজ ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। মধুবাবুর এ অস্থিরতা কিসের? কুমারী সুচিত্রা সেন দেখলেন, জগতের বুক জুড়ে চলেছে অশান্ত মানুষের ছায়ার মিছিল।

তাদের অস্থির পদচারণের মধ্যে লেখা রয়েছে অসত্য শহরের মরা ইতিহাস।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'
শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬০

শর্ট স্ট্রীটে কান্না

প্রশান্ত লাহিড়ী শর্ট স্ট্রীটেই ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন। তিনতলার ফ্ল্যাট। দোতলায় থাকেন এক ইংরেজ-দম্পতি। এসব অঞ্চলে সাধারণত দম্পতিরাই থাকেন। প্রত্যেকটা ফ্ল্যাট যেন অপরিচয়ের সমুদ্রে এক-একটি দম্পতি-দ্বীপ। জোড়া জোড়া স্বামী-স্ত্রী। দু-একটি ছেলেমেয়ে যা ছিল, তারা সব আছে কার্সিয়ংয়ের কন্‌ভেণ্টে, নয়তো দার্জিলিংয়ের সেণ্ট যোসেফ স্কুলে। একতলার সঙ্গে দোতলার সম্পর্ক নেই, দোতলার সঙ্গে নেই তিনতলার। সিঁড়ির পাশে ফ্ল্যাটে ঢোকবার দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে অতি সহজেই ভুলে যাওয়া যায় গোটা বাড়িটাকে, ভুলে যাওয়া যায় শর্ট স্ট্রীটের অস্তিত্ব। মনে হয়, কলকাতার টোপোগ্রাফির অংশ নয় শর্ট স্ট্রীট।

আজ কদিন হ'ল, একতলার ফ্ল্যাট খালি হয়ে গেছে। একজন জার্মান ইঞ্জিনিয়ার এক বছর এইখানে থেকে গেলেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ছিলেন। স্ত্রীও ইঞ্জিনিয়ার। বাবুর্চীদের মারফৎ খবর পাওয়া গেছে, এঁরা এসেছিলেন ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধক্রমে চাকরি নিয়ে। বেশ বড় চাকরি। দামোদরের জল থেকে উনিশ শো কত খ্রীষ্টাব্দে যেন কত কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা সম্ভব হবে, তারই খসড়া তৈরি করতেই এঁরা এসেছিলেন। খসড়ার কাজ নিশ্চয়ই শেষ হয়ে গেছে, তাই তাঁরা কদিন আগেই চ'লে গেলেন পশ্চিম-জার্মানিতে। বাবুর্চী-মহলের গুজব থেকে প্রশান্ত লাহিড়ী খবর পেয়েছেন যে, ওঁরা একই সঙ্গে কিলোওয়াট গণনা করতেন এবং একই সঙ্গে বসবাস করতেন বটে, আসলে ওঁরা বিবাহিত ছিলেন না। খবরটা কানে আসবার পর থেকে প্রশান্ত লাহিড়ী নিজের ফ্ল্যাটে ব'সেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। উদ্বিগ্ন হওয়ার কথাই। কোন রকম একটা অনুষ্ঠান ছাড়া শিক্ষিত মানুষেরা কেমন ক'রে যে স্বামী-স্ত্রীর মত শর্ট স্ট্রীটে এসে জীবন কাটিয়ে যান—সে কথা

ভেবে প্রশান্ত লাহিড়ী তাঁর নিজের ঘরেই পায়চারি ক'রে যাচ্ছেন ক্রমাগত। এই নিয়ে প্রশান্ত লাহিড়ীর ভাবনার শেষ নেই। ভাবতে ভাবতে তিনি চ'লে গেলেন বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট পর্যন্ত। সেখানে গিয়ে ঢুকে পড়লেন বইয়ের দোকানে। বই কিনবেন তিনি। প'ড়ে দেখবেন যুবক-যুবতীদের প্রেমের কাহিনী। পলাতকার প্রেম। কোন্ কোন্ উপন্যাসে নায়ক-নায়িকারা পালিয়ে গেছে, তার একটা লিস্ট চাইলেন প্রশান্ত লাহিড়ী দোকানদার গদাধরবাবুর কাছে। গদাধরবাবু তাঁর জীবনে এমন খদ্দের এই প্রথম পেলেন। প্রশান্ত লাহিড়ীকে নিয়ে তিনি বসলেন এসে শেল্‌ফের পেছনে—প্রাইভেট কামরায়। মুঙ্গের জেলার রামকিষণ ইঙ্গিত পেয়ে ছুটল চা আনতে। ভি. পি.র প্যাকেট প'ড়ে রইল গদাধরবাবুর পায়ের কাছে।

গদাধরবাবু বললেন, ভীষণ-বিক্রি উপন্যাসের সংখ্যা আমার অনেক। পাতায় পাতায় প্রেম, কথায় কথায় মনস্তত্ত্ব, সে কি সংস্কৃতি মশাই! সংস্করণ-সংখ্যা দেখবেন?

না। আমি এমন সব উপন্যাস দেখতে চাই, যাঁর নায়ক-নায়িকারা সব পালিয়েছে।—বললেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

কেন বলুন তো?

আমি জানতে চাই, পালিয়ে ওরা যায় কোথায়?

যাবে আর কোথায় মশাই, কলকাতায়ই থাকে। গা-ঢাকা দিয়ে বিদগ্ধ সমাজে বুক ফুলিয়ে চলবার মত সমাজ কলকাতা ছাড়া আর কোথায় পাবেন? আমাদের লেখকদের মধ্যে অনেকেই কৃষ্টি-মিশনের সঙ্গে প্রায় আধখানা পৃথিবী দেখে এসেছেন। সর্বত্রই এক ব্যাপার।

কি ব্যাপার?—জানতে চাইলেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

নায়ক-নায়িকারা কেউ বিয়ে-সাদি করছে না। দিনরাত কেবল বিড়বিড় ক'রে মনস্তত্ত্ব বলছে। আমিও বলি মশাই, টিটাগড়ে কাগজ আছে, অমুক স্ট্রীটে আছে লাইনো—আরও শ তিনেক পৃষ্ঠা পর্যন্ত নায়ক-নায়িকারা খোলাভাবে

ঘুরুক, কৃষ্টির কষে হুগলী কালির মুখ আরও কালো হয়ে উঠুক, চ'লে যাক ওরা হিল্লি-দিল্লী-বোম্বাই।—একটু হেসে গদাধরবাবু পুনরায় বললেন, টিকিট কিংবা থাকা-খাওয়ার তো পয়সা লাগছে না! কি দরকার ওসব বিয়ের কথা উচ্চারণ করার? আর লেখকেরা যদি শেষ পৃষ্ঠায় এসে উচ্চারণ করেনই, তাতে কোন ক্ষতি হচ্ছে না। শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কজনই বা উপন্যাস পড়ে, বলুন? যারা ভাগবে তারা তো আগে থেকেই বেলুনের মত ফুলে রয়েছে, মনস্তত্ত্বের হাওয়া ছাড়লে উড়তে কতক্ষণ?

কিন্তু সামাজিক জীবনে—

প্রশান্ত লাহিড়ীকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে গদাধরবাবু বললেন, ওসব সমাজ-টমাজ ছুঁড়ে ফেলে দিন নর্দমায়, এই নিন ফ্রয়েড। নাম শুনেছেন?

সামনে-দাঁড়ানো একজন কর্মচারীর হাত থেকে ছ-সাতখানা রঙ-বেরঙের বই নিয়ে তিনি প্রশান্ত লাহিড়ীকে পুনরায় বললেন, এদের নায়ক-নায়িকারা সব পালিয়েছে। যতীন, ক্যাশমেমো কাটো।

কর্মচারী যতীন পুরনো লোক। সে ক্যাশমেমো কেটেই এনেছে। হিসেবমত সব পয়সাই চুকিয়ে দিয়ে প্রশান্ত লাহিড়ী উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় গদাধরবাবু অনুরোধ করলেন, চা—চা খেয়ে যান। রামকিষণ—

জী!—জবাব দিল রামকিষণ গদাধরবাবুর পেছন দিকের একটা শেলফের আড়াল থেকে। প্রশান্ত লাহিড়ী দেখলেন, মুঙ্গের জিলার রামকিষণ লুকিয়ে লুকিয়ে চায়ের প্লেটে চুমুক মারছে। কৃষ্টির কষে দেহাতী রামকিষণের মুখের স্বাদও গেছে বদলে।

বিশেষ ধন্যবাদ। আজ আমি চলি। অন্য একদিন এসে চা খেয়ে যাব।—নমস্কার ক'রে বইয়ের প্যাকেটটি হাতে নিয়ে প্রশান্ত লাহিড়ী চ'লে এলেন দোকানের বাইরে। বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট ধ'রেই তিনি পড়লেন কলেজ স্ট্রীটের ওপর। গাড়িটাকে দাঁড় করাতে হ'ল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সব রাস্তা পার হচ্ছিল। তিনি স্টিয়ারিং ধ'রে চেয়ে রইলেন মেয়েদের দিকে।

একটি মেয়ে যেন ঠিক উৎপলার মত দেখতে মনে হ'ল প্রশান্ত লাহিড়ীর। উৎপলা? পলা? তাই তো! পেছন থেকে একটা গাড়ি হর্ন বাজাচ্ছে। রাস্তা ছেড়ে দিয়ে তিনি গাড়ি চালিয়ে চ'লে এলেন চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে। পলার সঙ্গে মেয়েটির কি অত্যাশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে!

শর্ট স্ট্রীটে ফিরে আসতে তাঁর বেশ একটু রাত হ'ল। বাইরের ফটক দিয়ে তিনি এক রকম নিঃশব্দেই ভেতরে প্রবেশ করলেন। নতুন গাড়িতে শব্দ হওয়ার কথাও নয়। কোথাও কোন জনমানব নেই। থাকলেও এ অঞ্চলে মানব-সংখ্যা খুবই কম। হিসেব করলে হয়তো প্রতি বর্গ মাইলে গড়গড়তা আঠার জনের বেশি হবে না। হিসেব করলে হয়তো দেখা যাবে, প্রতি বর্গ মাইলে গড়পড়তা ছত্রিশটা ক'রে কুকুর বাস করে। বিলিতী কুকুর। প্রশান্ত লাহিড়ীর পায়ের আওয়াজ পেয়ে দোতলার ইংরেজ-দম্পতির অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। রোজই করে। গাড়িটাকে গ্যারেজে তুলে দিয়ে তিনি লাল সুরকির রাস্তা ধ'রে এগুতে লাগলেন বাড়ির দিকে। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে প্রশান্ত লাহিড়ী ডান দিকে চাইলেন একবার। চাইতে হ'ল। একতলার ফ্ল্যাটের দরজাটা বন্ধ রয়েছে। ইচ্ছে হ'ল, ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলেন তিনি। ভেতরে গিয়ে দেখে আসতে চাইলেন, জার্মান-পরিবারটি তাঁদের জীবনযাত্রার কোন চিহ্ন ফেলে গেছেন কি না! অন্তত এক ফোঁটা চোখের জল যদি ফেলে গিয়ে থাকেন! প্রশান্ত লাহিড়ী শুনতে পেয়েছেন যে, জার্মান-মেয়েটির আসল স্বামী আজও বেঁচে আছেন। বেঁচে আছেন জার্মানিতেই। কি এক রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে দুজনের মধ্যে মতানৈক্য ঘটায় মেয়েটি চ'লে এসেছেন সংসার ভেঙে। রাজনৈতিক আদর্শের জন্যে তিনি সংসার ভাঙতে পারলেন, অথচ নৈতিক আদর্শ ধ'রে রাখবার জন্যে তিনি পারলেন না আপোস-রফা করতে!

প্রশান্ত লাহিড়ী দরজাটার আরও একটু কাছে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। একতলার শূন্য ফ্ল্যাট তাঁকে টানছে। তিনি যেন শুনতেও পেলেন সেই

জার্মান-মেয়েটির কান্না। অবিবাহিত জীবনযাপনের প্রেম পরিশুদ্ধ হয় নি অনুষ্ঠানের মন্ত্রোচ্চারণে। উপভোগের মাধুর্য নষ্ট হয়ে গেছে উপাসনার অভাবে। অতএব, প্রশান্ত লাহিড়ী ভাবলেন যে, জার্মান-মেয়েটি সবই সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু ফেলে গেছেন একতলার ফ্ল্যাটে তাঁর গোপন কান্না। লক্ষ কিলোওয়াটের চেয়েও এ কান্না বেশি শক্তিশালী। নইলে প্রশান্ত লাহিড়ীর কান পর্যন্ত এসে তা পৌঁছতে পারত না।

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিল তাঁরই নিজের ভৃত্য সতীশ। প্রশান্ত লাহিড়ী স'রে এলেন দরজার কাছ থেকে। সতীশ বললে, পাপ বিদেয় হয়েছে দাদাবাবু। নতুন ভাড়াটে আসছে।

তাই নাকি?—সিগারেটে বেশ জোরে টান দিয়ে তিনি পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছিলেন।

সতীশ বললে, আমাদের এলাহাবাদের মত ছোট জায়গায় ইজ্জত আছে। কিন্তু এসব পাড়ায় ইজ্জতের কোনও বালাই নেই।

ঠিক, ঠিক কথা। তা ছাড়া এখানে অনেক রকমের সুবিধেও আছে।

সুবিধেগুলো জানবার জন্যেই যেন সতীশ চেয়ে রইল প্রশান্ত লাহিড়ীর দিকে। দু ধাপ ওপরে উঠে তিনি বললেন, লুকিয়ে থাকবার পক্ষে এসব জায়গা খুবই ভাল সতীশ। কিন্তু মানুষ কি তার অপরাধ-উপলব্ধি থেকে চব্বিশ ঘণ্টাই লুকিয়ে থাকতে পারে?

পারে না—ভাবলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। পারে না ব'লেই জার্মান-মেয়েটির কান্না তিনি নিজের আবদ্ধ ফ্ল্যাটে ব'সেও শুনতে পান।

। দুই ।

আজ প্রায় এক বছর হ'ল প্রশান্ত লাহিড়ী তাঁর এলাহাবাদের বাড়িতে তালা লাগিয়ে কলকাতায় এসে বসবাস করছেন। তিনি ব্যবসায়ী। উত্তর-

প্রদেশে লাহিড়ী অ্যাণ্ড কোম্পানি মদ বিক্রির বড় প্রতিষ্ঠান, পুরনোও বটে। পিতার আমলের ব্যবসা থেকে তাঁর প্রচুর পয়সা আসে। আসে এক রকম বিনা আয়াসেই। তাঁর পিতা হেরম্ব লাহিড়ী ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া-প্রকৃতির মানুষ।

মদ খাওয়া তো দূরের কথা, মদের গন্ধ পর্যন্ত তিনি সহ্য করতে পারতেন না। উপরন্তু বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়ে তিনি প্রতি বছরই জানিয়ে আসতেন যে, উত্তর-প্রদেশের মদ্যপায়ীরা যদি মদ খাওয়া ছেড়ে দেয় তা হ'লে তিনি মনে মনে খুশিই হবেন। মরবার সময়ও তিনি তাঁর একমাত্র সন্তান প্রশান্তকে সেই কথাই জানিয়ে গিয়েছিলেন। উত্তর-প্রদেশের লোকেরা মদ ছাড়ে নি, কিন্তু প্রশান্ত লাহিড়ী ব্যবসা ছেড়েছেন। ছাড়িয়েছে পলা। পলা মানে এলাহাবাদের উৎপলা সান্যাল। ভারতীয় নৃত্যে কৃতিত্ব ছিল তার অসাধারণ, ফৈয়াজ খানের ঘরোয়ানা খেয়াল উৎপলা সান্যালের কণ্ঠে রূপ পেয়েছিল আশাতীতভাবে, ইংরেজী শিক্ষা ও ভাষার ওপর দখল ছিল তার অপরিসীম। ইচ্ছে করলেই উৎপলা সান্যাল এলাহাবাদের কিংবা লোকায়ত ভারতবর্ষের যে-কোন লোককে বিয়ে করতে পারত। কিন্তু বিয়ে তার নিজের মতে হ'ল না, হ'ল পিতামাতার ইচ্ছানুসারে। আর হ'ল এক অল্পশিক্ষিত সাধারণ মানুষের সঙ্গে। প্রশান্ত লাহিড়ী সেই সাধারণ মানুষ।

বিয়ের পর প্রশান্ত লাহিড়ী আরও বেশি ক'রে সাধারণ হতে লাগলেন। উৎপলা যখন তার আন্তর্জাতিক বন্ধু-গোষ্ঠীকে নিয়ে বসবার ঘরে বিশ্ব-কলার আলোচনায় ব্যস্ত থাকত, প্রশান্ত লাহিড়ী তখন সবচেয়ে দূরের চান-ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে হাজার ছিদ্রের ঝরনার নীচে দাঁড়িয়ে মাথায় দিতেন ঠাণ্ডা জল। বিয়ের পর তিনি উৎপলার নৃত্য-অনুষ্ঠানেও যোগ দিতেন না। এখানে ওখানে নৃত্য-অনুষ্ঠানে উৎপলা যখন নাচতে যেত, প্রশান্ত লাহিড়ী তখন বিনা কারণে লাহিড়ী অ্যাণ্ড কোম্পানির অফিসে ব'সে স্কচ হুইস্কির স্টক মেলাতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ক্রমে ক্রমে তিনি তাঁর স্ত্রীর সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবার

সাহস পর্যন্ত হারিয়ে ফেলতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, উৎপলার যোগ্য স্বামী হতে গেলে তাঁকে শিক্ষিত হতে হবে। তিনি ঠিক করলেন, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক অমিভাত সেনকে প্রাইভেট টিউটর রাখবেন। অমিতাভ তাঁর বাল্যবন্ধু। রাখলেনও তাঁকে মাসিক এক শো টাকা মাইনেতে।

বিয়ের ছ মাস পর উৎপলার এল জন্মদিন। ড্রয়িং-রুমে বন্ধুবান্ধবরা সব তার অপেক্ষা করছিলেন। প্রশান্ত লাহিড়ী অপেক্ষা করছিলেন উৎপলার শোবার ঘরের বাইরে। উৎপলা তখন কাপড় পরছিল। একটু পরে প্রশান্ত লাহিড়ী বাইরে থেকেই জিজ্ঞাসা করলেন, আসতে পারি কি ?

জবাব এল, এস। আমার হয়ে গেছে।

তিনি প্রবেশ করলেন উৎপলার শয়ন-কামরায়। মাথা নীচু ক'রেই প্রবেশ করলেন।

উৎপলা জিজ্ঞাসা করলে, কিছু বলবে ?

হ্যাঁ।

বল, আমি শুনছি। ঠোঁটে রঙ মাখছি বটে, কান তো আমার খোলাই রয়েছে।

প্রশান্ত বললেন, আমি জানতে চাইছিলুম, নারায়ণশিলা সামনে রেখে মাস ছয়েক আগে আমরা যে একটা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলুম, তার কোন মূল্য কিংবা অর্থ আছে কি না!

উৎপলা হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না। অথবা হঠাৎ কোন জবাব দেওয়া প্রয়োজন বোধ করল না এলাহাবাদের উৎপলা সান্যাল। প্রসাধন শেষ করবার পর সে বললে, লাহিড়ী অ্যাণ্ড কোম্পানির সাইনবোর্ডের মত অনুষ্ঠান যদি কেবল স্বামী-বিজ্ঞাপন ব'য়ে বেড়ায়, তা হ'লে আমি তার কাণাকড়িও মূল্য দিই না। কোন শিক্ষিত পুরুষ কিংবা মেয়েই দেবে না।

কিন্তু সব দেশেই তো বিয়ের একটা অনুষ্ঠান থাকে, হয়তো নারায়ণশিলা সব দেশে থাকে না। তা ছাড়া বিজ্ঞাপনের সবটুকুই তো মিথ্যে নয় পলা ?

তুমি কি আজকের দিনে আমার সঙ্গে তর্ক করতে এসেছ?

না। তোমাকে জানাতে এসেছি যে, আমি অমিতাভর কাছে নিয়মিত লেখাপড়া শিখছি। অনেকে ভালবাসার পর বিয়ে করে, অনেকে বিয়ের পর ভালবাসে। আমার বাবা ছিলেন শেষের দলের লোক। মা কিন্তু নাম সই করতে জানতেন না।

উৎপলা কোন জবাব দিল না, কেবল বললে, আজ আর পড়তে ব'সো না। কারণ অমিতাভবাবুকে আমি নেমন্তন্ন করেছি।

প্রশান্ত লাহিড়ী পকেট থেকে একখানা চেক-বইয়ের পাতা বার ক'রে উৎপলার দিকে এগিয়ে ধ'রে বললেন, জন্মদিনে তোমার শতায়ু কামনা করি। সেই সঙ্গে তোমার হাতে তুলে দিলুম শত হাজার টাকাও।

শত হাজার?—বিস্ময়ের দৃষ্টিতে প্রশ্ন করল উৎপলা।

হ্যাঁ, এক লক্ষ টাকা।

অঙ্কটা বুঝতে উৎপলার আর কোন অসুবিধে হ'ল না। বোকা পুরুষগুলোর হাতে টাকা পড়লে স্ত্রীর জন্মদিনে ওরা টাকা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না, ভাবলে উৎপলা। সে আরও ভাবলে যে, এই টাকাটা তার জীবনের সবচেয়ে বড় অভাবটাকে ঘুচিয়ে দিতে পারবে।

দু দিন পর প্রশান্ত লাহিড়ী টের পেলেন, অভাবের সবটুকুই উৎপলা ফেলে গেছে এলাহাবাদের বাড়িতে। তাই তার জন্মদিনে কেবল প্রশান্ত লাহিড়ীই নেমন্তন্ন পান নি।

অমিতাভ সেন এলেন সন্ধ্যের সময় অন্য একদিন। বললেন, প্রশান্ত, আমি আজ উন্মোচন করব শতাব্দীর মুখ থেকে অজ্ঞানতার ঘোমটা। আলোচনা করব ডায়লেকৃটিক্যাল জড়বাদ।

প্রশান্ত লাহিড়ীর মুখের দিকে চেয়ে অধ্যাপক অমিতাভ সেন একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তিনি বুঝলেন, সাংসারিক বিপর্যয়ের ছায়া

পড়েছে তাঁর মুখে। এ ছায়ার বিস্তৃতি বুঝি অধ্যাপকের ডায়লেকৃটিক্যাল জড়বাদকেও ঢেকে ফেলতে চায়। প্রশান্ত লাহিড়ী পকেট থেকে একটা চিঠি বার ক'রে বললেন, প'ড়ে দেখো।

অমিতাভ সেন পড়তে লাগলেন :

আমি এলাহাবাদ ছাড়লুম। তোমাকে কেন্দ্র ক'রে যে-সংসার গ'ড়ে উঠেছে, তাতে আমার স্থান নেই। আমি ছ মাসেই হাঁপিয়ে উঠেছি। ছ বছর বাঁচলে আমার গায়ে আর মাংস থাকত না। থাকত কেবল কখানা হাড় এবং হাড়ের তলায় ক্রনিক হাঁপানি। একটা সূক্ষ্ম ও সঙ্কীর্ণ অ্যানাটমিক্যাল অস্তিত্ব তোমার কি কাজে লাগত প্রভু? নারায়ণশিলার সামনে তুমি কি যে কতকগুলো সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছিলে, তাতে তোমার কোন অপরাধ হয় নি। অপরাধ নেওয়ার মত ক্ষমতা পাথরের নেই—আছে আমার। আমি তোমায় যাবতীয় অপরাধ থেকে মুক্তি দিয়ে গেলাম। আমায় খোঁজবার জন্যে অনর্থক সময় নষ্ট করলে লাহিড়ী অ্যাণ্ড কোম্পানির আয় কমবে। কলকাতার আশেপাশে শুনেছি অনেক রিফিউজী এসেছে। তা থেকে একটা কি দুটো লাল-টুকটুকে বউ বেছে নিয়ে আসবার স্বাধীনতা তোমার রইল। বোধ হয় হাজার পাঁচেক বছর আগে থেকেই আছে। ইতি—উৎপলা।

চিঠিখানা প্রশান্ত লাহিড়ীর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে অধ্যাপক সেন বললেন, মিসেস লাহিড়ী দেখছি তোমার জীবনে মস্তবড় একটা অভাব সৃষ্টি ক'রে গেলেন।

না অমিতাভ, অভাবের সবটুকুই উৎপলার। মস্ত বড় এবং সর্বনেশে অভাব।

কেন, ব্যাঙ্কে রয়েছে তাঁর তোমারই দেওয়া এক লক্ষ টাকা, আর—আর কেউ কি সঙ্গে নেই?—চশমার কাচ পরিষ্কার করতে লাগলেন অধ্যাপক অমিতাভ সেন।

প্রশান্ত লাহিড়ীর চোখের স্বাস্থ্য ভাল। দু-একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁর চোখের পাতা ভিজে ওঠে না। তিনি তাই বললেন, সঙ্গে ওর নিশ্চয়ই কেউ

আছে, নইলে আমাকে ও জানিয়ে যেত। পালিয়ে যেত না। টাকাগুলো অন্তত সে ফেলে রেখে যেত এলাহাবাদেই। কিন্তু আমি টাকার কথা ভাবছি না, ভাবছি পলার কথা।

কি কথা?

আমার মনে হয়, ওর প্রেমের দামোদরে যত জলই থাক্ না কেন, তা থেকে এক কিলোওয়াটও কল্যাণ আসবে না। আসতে পারে না।—শেষের কথাটা অত্যধিক জোর দিয়ে উচ্চারণ করলেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

অধ্যাপক সেন জিজ্ঞাসা করলেন, কেন পারে না প্রশান্ত? তুমি যদি সারাজীবন নারায়ণশিলার ওপর নির্ভর করতে পার, মিসেস লাহিড়ী কেন পারবেন না বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে?

অনুষ্ঠানের সত্য বিজ্ঞানের চেয়েও বড় অমিতাভ। তা ছাড়া বিয়ে কেবল দুজনের মধ্যেই হয় না, তৃতীয় পক্ষও একজন থাকেন।

মিসেস লাহিড়ীর চিঠি প'ড়ে সে কথা মনে হয় না। মনে হয়, তিনি বিবাহের প্রয়োজনই স্বীকার করেন না। দুজনের মধ্যে যদি মন ও মাথার মিল থাকে, তবে অনুষ্ঠানের দরকার কি? হয়তো তোমার চেয়ে অপর পুরুষের সন্তান হবে বেশি বলিষ্ঠ। জারজ কথাটার অভিধানগত অর্থ আছে বটে, কিন্তু অর্থটার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই।

প্রশান্ত লাহিড়ী তর্কের খাতিরেও আর তর্ক করলেন না। ব'সে ব'সে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তিনি সাধারণ মানুষ, তাঁর ভাবনার মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জটিলতা থাকবার কথা নয়। তবুও আজ তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। বউ পালিয়ে গেলে অসাধারণ মানুষদেরও চিন্তা আসে, আসে অপমানবোধ এবং আরও অনেক রকমের উপসর্গ।

একটু পরে প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন, পালিয়ে গেলেও পলার অভাব ঘুচবে না অমিতাভ। কারণ, অবিবাহিত জীবনের অপরাধ-উপলব্ধিই তার সবচেয়ে বড় অভাবের সৃষ্টি করবে।

সমাজতত্ত্বের সর্বজনীন আলেখ্য বদলে গেছে, তুমি বোধ হয় তা টের পাও নি প্রশান্ত ?

তাতে কোন ভয়ের কারণ আছে ব'লে আমি মনে করি না। আসল ভয় হচ্ছে, মানুষের মন থেকে যদি অপরাধবোধ লোপ পায়, তবে সমাজ কিংবা সমাজতত্ত্বের মূল্য রইল কি ? অপরাধবোধ ওর লোপ পায় নি ব'লেই আমার বিশ্বাস। কারণ, পলার কান্না আমি শুনতে পাচ্ছি।

সেন্টিমেণ্টাল হওয়ার মত রস ও রসদ তোমার স্টকে প্রচুর পরিমাণে জ'মে আছে প্রশান্ত। আমার মনে হয়, তোমার বাবা জানতেন তাঁর সন্তানের ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা। সেই জন্যেই তিনি তোমার হাতের কাছে রেখে গেছেন অগণিত হুইস্কির বোতল। ছিপি খোলার সময়টুকুই তোমার কেবল নষ্ট হবে।

আমরা তো কেউ মদ খাই না অমিতাভ।

না খেয়েই তবে মাতলামি করছ কেন ? নইলে তুমি কান্না শুনবে কেমন ক'রে ? মিসেস লাহিড়ী কাঁদতে যাবেন কোন্ দুঃখে ?

তার নিজের দুঃখে।—জবাব দিলেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

অধ্যাপক যাওয়ার জন্যে উঠে পড়লেন। জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনা করবার সময় এ নয়। তিনি চ'লেই যাচ্ছিলেন। আবার কি মনে ক'রে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেয়েছি। বিশ্বের আয়তন আমার বাড়ল। যে কোন মুহূর্তে কলকাতায় চ'লে যাব। বউকে খোঁজবার জন্যে কখনও যদি কলকাতা যাওয়ার ইচ্ছা হয়, তবে চ'লে এস সোজা আমার আস্তানায়। বউ তোমায় অতি অবশ্য টানবে।

হ্যাঁ, পলার কান্না আমায় টানছে। সাত দিন তো হয়ে গেল !

গুড-নাইট প্রশান্ত।

প্রশান্ত লাহিড়ী সেন্টিমেণ্টাল নন। তিন ফোঁটা চোখের জল পর্যন্ত তাঁর পড়ল না। দিবা-রাত্র তিনি উৎপলার কান্না শুনতে পাচ্ছেন, অথচ খবরের

কাগজে একটা সংক্ষিপ্ততম বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত দেওয়ার তাগিদ অনুভব করলেন না প্রশান্ত লাহিড়ী। উৎপলার শয়ন-কামরার দেওয়ালগুলোতে তিনি সময়-অসময়ে হাত বুলোতে লাগলেন। বুঝতে পারলেন, দেওয়ালগুলো সব ভিজে উঠেছে। তবুও তাঁর পাষাণ-হৃদয় বিচলিত হ'ল না। পথ-ক্ষ্যাপা হয়ে তিনি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন না পলার পালিয়ে-যাওয়া পথটির অনুসন্ধান-উদ্দেশ্যে। পুরনো ভৃত্য সতীশ ছাড়া অন্য কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে তিনি বাক্যালাপ করলেন না পুরো একটি বছর। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের নির্ভরযোগ্য নীতির গণ্ডি তিনি টানলেন তাঁর নিজের চারদিকে। অনাবশ্যক হা-হুতাশ তাঁর চরিত্রের বাঁধনকে শিথিল করতে পারল না তিলেকমাত্র। প্রশান্ত লাহিড়ীর বিশ্বাস, পলা ফিরে আসবে। রোমাণ্টিক ব্যর্থতার রাস্তা দিয়ে সে আসবে না। সে আসবে তার অপরাধবোধের সাবেক রাস্তা ধ'রেই। পলাকে খোঁজবার দরকার নেই। পলা তাঁর কাছ থেকে হারায় নি। পলা হারিয়েছে ওর নিজের কাছ থেকে। অতএব, তিনি কেন কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেবেন ? লক্ষ টাকার ওপর আবার কেন তিনি খরচ করবেন সাড়ে বারো টাকা ? প্রাইভেট টিকৃটিকি লাগিয়ে কি দরকার তাঁর পলাকে খুঁজে আনবার ?

তবুও তিনি কলকাতা এলেন। রইলেন প্রায় এক বছর। আর রইলেন এই শর্ট স্ট্রীটের তিনতলার ফ্ল্যাটে। বড় ফ্ল্যাট। অধ্যাপক অমিতাভ সেনের সঙ্গে তিনি দেখা করেন নি। লেখাপড়া শেখবার সময় এ নয়। এটা তাঁর কান্না শোনবার সময়। পুরো দুটো বছরই তিনি কান্না শুনলেন—উৎপলার কান্না।

। তিন ।

জার্মান-পরিবারটি চ'লে যাওয়ার পর একতলার ফ্ল্যাটটা খালিই প'ড়ে ছিল। হয়তো দু-একদিনের মধ্যে নতুন দম্পতি এসে দখল করবেন ঘরগুলো। তাঁদেরও

থাকবে না সন্তান কিংবা আত্মীয়স্বজনের ভিড়। দু-একটা অ্যালসেশিয়ান নিশ্চয়ই থাকবে।

কিন্তু প্রশান্ত লাহিড়ী আজ মাঝরাতে হঠাৎ বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। দরজা খুলে চ'লে এলেন পিছন দিকের বারান্দায়। একতলার ফ্ল্যাট থেকে কান্নার শব্দ আসছে। তবে কি জার্মান-মেয়েটি আবার ফিরে এসেছেন? অনুতাপ করছেন কি তাঁর পশ্চাতের ভুল সংশোধন করবার জন্যে? কিন্তু গলার আওয়াজটা তো বিদেশিনীর ব'লে মনে হচ্ছে না! অনেকটা উৎপলার গলার মতই শোনাচ্ছে। প্রশান্ত লাহিড়ী ভাবলেন, পাপপুণ্যের মূল্যবোধ বিদেশিনীর মনেও হয়তো সর্বজনীন আক্ষেপের সুর তুলেছে আজ। অপরাধ-উপলব্ধির মধ্যে জার্মান-মেয়েটিও সম্ভবত ফিরে পেয়েছেন তাঁর সত্য পরিচয়—যে পরিচয়ের বিশ্লেষণের মধ্যে পশ্চিম-জার্মানির স্বামী তাঁর উহ্য হয়ে যান নি। এই উহ্য না হওয়াটাই তো নীতি। নীতি এসেছে অনুষ্ঠানের অংশ থেকে। অংশের পেছনে আছে বহুলাংশ। বহুলাংশের সমষ্টিগত সামগ্রীক সূচনা কোথা থেকে এল? এল 'ইতি' ও 'নেতি'র মহাব্যোমেরও উর্ধ্বলোক থেকে। একই সূচনা, একই সমাপ্তি। পলাই হোক আর জার্মান-মেয়েটিই হোক, ব্যথা তাদের একই। কান্নার সুরে তাই অদ্ভুত সামঞ্জস্য রয়েছে। প্রশান্ত লাহিড়ী কান পেতে রইলেন। কান্নার সুর চড়ছে। খুবই বিস্ময় বোধ করলেন তিনি। কাল্পনিক কান্না নয়, সত্যিকারের কান্না। একটু পরে তাঁর যেন মনে হ'ল, প্যাকেট-বাঁধা গদাধরবাবুর উপন্যাসগুলো থেকেও বুঝি কান্নার শব্দ আসছে। তিনি চ'লে এলেন ভেতরে। ছিঁড়ে ফেললেন প্যাকেটের কাগজ। শব্দ হ'ল, কান্নার শব্দ!

উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা সব বুঝি 'কিউ' দিয়ে দাঁড়িয়েছে আজ কাঁদবার জন্যেই! শর্ট স্ট্রীটে কেউ কাঁদে না। আজ কেন নিয়মের ব্যতিক্রম?

ঘরের দরজায় মৃদু করাঘাত হ'ল। প্রশান্ত লাহিড়ী ছুটে এসে দরজা খুলে দিলেন। সামনে দাঁড়িয়ে অধ্যাপক অমিতাভ সেন। মাথার চুল সব পেকে

উঠেছে। গালের চামড়ায় তাঁর অসংখ্য ভাঁজ। ডান হাত ও বাঁ হাতের সবগুলো আঙুলেই নিকোটিনের রঙ। দু ঠোঁটের মাঝখানে একটা সিগারেটের অংশ এখনও লাগানো রয়েছে। থুতুর সঙ্গে নিকোটিনের রঙ মিশে সিগারেটের গোড়ার দিকটা ভিজে উঠেছে প্রায় সিকি ইঞ্চি। অধ্যাপক অমিতাভ সেন হাঁপাচ্ছিলেন।

প্রশান্ত লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, এ কি চেহারা তোমার অমিতাভ? ভেতরে এস।

অধ্যাপক সেন প্রশান্ত লাহিড়ীর হাতে ভর দিয়ে অতি কষ্টে প্রথম ঘরটা পার হতে হতে জিজ্ঞাসা করলেন, আর কটা ঘর পার হতে হবে বন্ধু?

এটা অতিথিদের থাকবার ঘর। তার পর আমার বসবার ঘর। তার পর আমার নিজের শোবার ঘর। উপস্থিত তোমাকে আমার ঘরেই নিয়ে যাচ্ছি।

প্রশান্ত লাহিড়ীর কথা শুনে দাঁড়িয়ে পড়লেন অধ্যাপক সেন। বললেন, এত বড় বড় ঘর দিয়ে কি কর? যত সব অপদার্থ ক্যাপিটালিস্টদের টাকার গরম!

প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন, ঘরগুলো তো আমি তৈরি করি নি অমিতাভ?

তুমি কর নি, তোমার মতই একজন ক্যাপিটালিস্ট করেছে। আর করেছে একজন বউ-পাগলা উন্মাদের জন্যেই। তোমার এখানে থাকবার কি দরকার ছিল?

দরকার ছিল তোমার মত একজন বন্ধুকে আশ্রয় দেবার। তোমার বোধ হয় হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে অমিতাভ।

কষ্ট হচ্ছে ব'লেই তো তোমার কোলে উঠতে চাই। আমরা ক্যাপিটালিস্টদের কোলে উঠেই তাদের ঘাড় মটকাব। চুক্-চুক্ ক'রে রক্ত শুষে খাব। ভয় পাচ্ছ নাকি প্রশান্ত?

ভয়? না, ভয় পাব কেন? কতই বা তোমার ওজন হবে!

বেশি নয়, জামা জুতো নিয়ে নব্বই পাউণ্ড।

মাত্র নব্বই ?

হ্যাঁ, বন্ধু। উদ্বৃত্ত কিছু নেই। গত দু বছরে পঞ্চাশ পাউণ্ড ক’মে গেছে। আমাকে দেখে বোধ হয় তোমার মনে হচ্ছে, আমি বুঝি পৃথিবীর প্রাইমোরডিয়াল যুগ এখনও উত্তীর্ণ হতে পারি নি। নৃতত্ত্ববিদ্‌রা বলবেন, আমি এখনও জন্মাই নি বন্ধু। নাও, কোলে নাও।

কোলে ওঠবার জন্যে অধ্যাপক সেন একটু ঝুঁকে দাঁড়ালেন প্রশান্ত লাহিড়ীর বলিষ্ঠ বাহুর দিকে। তিনি দেখলেন, অধ্যাপক সেন টলছেন। তিনি তাই তাড়াতাড়ি তাঁকে আলগা ক’রে তুলে ফেললেন কোলে। কোলে উঠে অধ্যাপক সেন জিজ্ঞাসা করলেন, বড্ড বেশি হালকা মনে হচ্ছে, না ?

হ্যাঁ।

আমি হালকা, তুমি ভারী। তুমি পুরনো, আমি আধুনিক। বন্ধু, সেই জন্যেই আমরা চাই শ্রেণীহীন সমাজ। সংগ্রাম আমাদের পদে পদে।

দুগ্ধফেননিভ শয্যায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন অধ্যাপক সেন।

প্রশান্ত লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার অসুখটা কি ?

ধমকে উঠলেন অমিতাভ সেন, অসুখ ? যত বড় অসুখই হোক, শ্রেণী-সংগ্রাম তো সোজা কথা নয়। চালিয়ে যেতে হবে, নিজে যদিও এখন চলতে পারছি না। প্রশান্ত, সমাজ-বিপ্লব আসছে। তোমার একতলা পর্যন্ত বোধ হয় এসেই গেছে।—ব’লে তিনি চোখ বুজলেন। ঘুম আসছে অমিতাভ সেনের।

তবুও প্রশান্ত লাহিড়ী সাধারণ মানুষের মতই প্রশ্ন করলেন আবার, চারদিকে এত বড় বড় সব ডাক্তার রয়েছেন, চিকিৎসা করাও নি কেন ?

চিকিৎসা ? কান্নার আবার কোন চিকিৎসা আছে না কি ? সেই যে এলাহাবাদে তুমি আমায় কান্নার গল্পটি শুনিয়ে দিলে, তারপর থেকে গত দুটো বছর আমি ঘুমোতে পারি নি বন্ধু। আমি বিষ খেয়েছি প্রশান্ত।

বিষ ? মানে, কি বিষ ?—ভয় পেয়ে প্রশান্ত লাহিড়ী ঝুঁকে দাঁড়ালেন অধ্যাপক সেনের মুখের ওপর। অমিতাভ সেন জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগলেন,

বিষ খেয়েছি আমি, তরল বিষ। জলীয় বিষ। সে কি কান্না! আমার ঘুম আসছে প্রশান্ত। একটা ভদ্র এবং ভয়শূন্য পরিবেশে এই তো আমার প্রথম ঘুম আসছে। দুটো বছর আমি যেন শরশয্যায় শুয়ে ছিলুম।

অধ্যাপক সেনের মুখ থেকে পোড়া সিগারেট গড়িয়ে পড়ল বিছানার ওপর। তিনি চোখ বুজলেন। ঘুমিয়ে পড়লেন দু-এক মিনিট পরেই। পোড়া সিগারেটের অংশটাকে ফেলে দিলেন প্রশান্ত লাহিড়ী ছাইদানির মধ্যে। তারপর তিনি অধ্যাপক সেনের পা থেকে স্ট্র্যাপ-ছেঁড়া কাবুলী চটিটা খুলে নিয়ে ফেলে রাখলেন মেঝের ওপর। ছোট টী-পয়টা নিয়ে এলেন বিছানার কাছে। জলের গেলাসটা সাজিয়ে রাখলেন তারই ওপর। গেলাসের পাশে রেখে দিলেন 'পাঁচ পাঁচ পাঁচ' মার্কা একটা আনকোরা নতুন টিন। অধ্যাপক সেন কেবল অসুস্থ নন, অস্বাভাবিকও বটে—ভাবলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। তিনি আরও ভাবলেন, অসুস্থ এবং অস্বাভাবিক ব'লেই অমিতাভ সেনের বন্ধুত্ব তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না। পারলেন না তাঁকে ফেলে দিয়ে আসতে শর্ট স্ট্রীটের বাইরে যে-কোন দাতব্য চিকিৎসালয়ে। প্রশান্ত লাহিড়ী সাধারণ মানুষ, উচ্চশিক্ষিত নন। তাই অমিতাভ সেনের ব্যথা নিজের ব্যথা ব'লেই অনুভব করলেন তিনি। বুঝলেন, ব্যথার রাজ্যে কোন শ্রেণীবিভাগ নেই।

একতলার ফ্ল্যাট থেকে কান্নার শব্দটা উঠে আসছিল ওপর দিকে, একেবারে প্রশান্ত লাহিড়ীর ঘর পর্যন্ত। জানলা-দরজাগুলো বন্ধ ক'রে দিলেন তিনি। অধ্যাপক সেন ঘুমোচ্ছেন। শর্ট স্ট্রীটের কান্না যেন তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটায়। নিবিয়ে দিলেন বাতিটাও। অক্ষিপটে যদি আলোর আঘাত সহ্য না হয়? নেত্রগোলক জুড়ে তাঁর ছড়িয়ে রয়েছে বছর দুইয়ের অন্ধকার। হঠাৎ আলো হয়তো তাঁকে আরও বেশি ক'রে অসুস্থ ক'রে তুলবে। প্রশান্ত লাহিড়ী পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলেন ঘরের বাইরে। একতলার কান্না তাঁকে টানছে।

সিঁড়িতে বাতি নেই ব'লে একতলার ফ্ল্যাটের দরজাটা তিনি দেখতে পেলেন না। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললেন প্রশান্ত লাহিড়ী। মনে হ'ল, ভেতর থেকে

দরজা বন্ধ করা নেই। আস্তে একটু ঠেলা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। কান্নার শব্দটা স্পষ্টতর হ'ল। উৎপলার কণ্ঠস্বর ব'লেই তাঁর মনে বিশ্বাস জন্মেছে। তিনি ভাবলেন, পলার কণ্ঠে তার অপরাধ-স্বীকৃতির ঘোষণাটাই ধ্বনিত হচ্ছে নির্ভুলভাবে। জার্মান-মেয়েটির ব্যথাও পলার ব্যথা। হয়তো বা এ শতাব্দীর শরশয্যায় বিশ্বনারীর দেহ আজ ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছে।

প্রশান্ত লাহিড়ী দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লেন ঘরে। ঘর-ভরতি আসবাব। আজই এসেছে ব'লে মনে হ'ল তাঁর। সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবার সময় হয় নি ভাড়াটেদের। কিংবা আসবাবের প্রয়োজন হয়তো এঁদের আর কারও নেই।

ডান দিকের একটা ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ আসছিল। তিনি দাঁড়ালেন এসে সেই ঘরটার বাইরে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি শুনতে লাগলেন কান্নার ভাষা। প্রশান্ত লাহিড়ী সাধারণ মানুষ। ভাষা যদি জটিল না হয়, তবে তিনি তার অর্থ অবশ্যই বুঝতে পারবেন। বুঝতে তিনি পারলেনও। উৎপলা ক্ষমা চাচ্ছে। ওরই কান্নার মধ্যে দিয়ে ক্ষমা চাচ্ছে অস্বামিক বিংশ শতাব্দী।

ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েই প্রশান্ত লাহিড়ী অনুরোধ করলেন, আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি পলা। চ'লে এস।

কোথায় যাব ?—জানতে চাইল পলা।

শর্ট স্ট্রীটের বাইরে।—জবাব দিলেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

একটু পরে গ্যারেজ থেকে নতুন গাড়িটা বার ক'রে নিয়ে এলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। উৎপলা বসল তাঁরই পাশে। পেছন দিকে ফিরে চাইবার প্রয়োজন বোধ করলেন না তিনি। প্রয়োজন বোধ করলেন না তিনতলার অস্থাবর সম্পত্তিগুলো সঙ্গে নিয়ে আসবার। বিলিতী স্প্রিংয়ের খাটখানা তাঁর অনেক টাকায় কেনা। ডবল খাট। সেখানাও প'ড়ে রইল। প'ড়ে রইলেন খাটের ওপর তাঁরই বাল্যবন্ধু। প'ড়ে রইলেন উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক অমিতাভ সেন।

'শনিবারের চিঠি'
ফাল্গুন, ১৩৬০

সুনন্দার স্বপ্ন

কোথায় কোন্ এক বড় শহরে এইমাত্র সূর্য উঠল।

পূব দিকের জানলা দিয়ে তক্ষুনি নরম রোদ ছড়িয়ে পড়ল সুনন্দার বিছানার ওপর। রোদ যত নরমই হোক, দু-দশ মিনিট পরে সে গরম হয়ে উঠবেই। আজও উঠল। সুনন্দা বিছানায় শুয়েই হাতটা বাড়িয়ে দিল পূব দিকে। রোজই দেয়। সূর্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে জানলাটা বন্ধ না করলে বিছানাটা তেতে ওঠে, ঘুমুতে কষ্ট হয় সুনন্দার বেলা দশটা অবধি। এমনি ক'রে নিয়মমত সুনন্দা ঘুমুচ্ছে গত দশ বছর থেকে।

সুনন্দা পাস-করা মেয়ে। বি. এ. পাস। ইচ্ছে করলে সে আরও বড় বড় পরীক্ষায় পাস করতে পারত, কিন্তু তা সে করে নি। উচ্চশিক্ষার জন্যে স্বর্গীয় পিতার যে-ক'হাজার টাকা সে খরচ করেছে, তার জন্যে গোড়ার দিকে সুনন্দার খুবই দুঃখ হ'ত। তবে আজকাল সে মনে মনে ঠিক ক'রে নিয়েছে যে, টাকাটা ও বিশ্ববিদ্যালয়কে দেয় নি, দিয়েছে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে।

জানলাটা বন্ধ করতে গিয়ে সুনন্দা আরও কাশতে আরম্ভ করল। শুকনো কাশি। দু-চারবার কাশবার পর ওর মনে হ'ল যে, গলা দিয়ে বুঝি এক গণ্ডূষ বমি উঠে এসেছে। চ'লে এল চান-ঘরে। সুনন্দা দেখলে, বমি নয়,—রক্ত! রোমান্টিক রক্ত নয়, সত্যিকারের রক্ত। চান-ঘরে দাঁড়িয়েই সুনন্দা যেন অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলে, ধর্মদা, রক্ত! ওখান থেকে বেরিয়ে এল সুনন্দা। শুয়ে পড়ল বিছানায়। জানলাটা বন্ধ করার প্রয়োজন বোধ করল না আজ। রোদ আসুক। বড় শহরের ছোট্ট ঘরখানাতে ছড়িয়ে পড়ুক সূর্যের তেজ। আবদ্ধ অবসন্ন আবহাওয়ায় আজ বাসা বেঁধেছে ব্যাধি-বীজাণু। পূর্ণিমার চাঁদ পারবে না আর ঘরখানাকে ব্যাধিমুক্ত করতে। সুনন্দা শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, কেমন ক'রে তার স্বাস্থ্য-শিবিরে বীজাণুগুলো ঢুকে পড়ল! প্রোটিন কিংবা

ভাইটামিনের অভাব তার কোনদিনই হয় নি। উদ্বৃত্ত প্রোটিন তার প'ড়ে থাকে খাবারের টেবিলের ওপর। তবুও তার দেহে ফাটল ধরল কি ক'রে?

সিলিং ফ্যানটা ঘুরছে কাল রাত দশটা থেকে। একবারও সেটা বন্ধ হয় নি। উপস্থিত খোলা জানলা দিয়ে খানিকটা বাতাস ঢুকতেই পাখাটা কি রকম একটা শব্দ ক'রে উঠল! বাতাসের গতিটা যেন তাতে একটু বেড়েই গেল। সুনন্দার একটু শীত-শীত করছে। জ্বর আসবে না কি? বালিশের পাশ থেকে চিকনের ব্লাউজটা তুলে নিয়ে প'রে ফেলল সে। আগে থেকেই গরম ব্লাউজ পরবার দরকার নেই। থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর মাপতে হ'লে সন্ধ্যের আগে সে মাপতে পারবে না। এ সব জ্বর সন্ধ্যের দিকেই আসে।

সুনন্দা এবার নতুন ক'রে প্রোটিন ও ভাইটামিনের কথাটা ভাবতে আরম্ভ করল। ভাল ক'রে সে খায়, বেলা দশটা অবধি সে ঘুমোয়, বিকেলের দিকে আউটরাম ঘাটে বেড়াতেও যায়। গঙ্গার ওপারের চটকলের ধোঁয়া সুনন্দার নাক পর্যন্ত পৌঁছয় না। তবুও গলা দিয়ে রক্ত উঠে এল। এমন সুরক্ষিত দেহে ব্যাধি-বীজাণুর কোন প্রবেশ-পথই সে খুঁজে পেল না। এবার সুনন্দা দৃষ্টিপাত করল তার নিজের মনের মধ্যে। বীজাণু কেবল দেহের রাস্তা ধ'রে আসবে তেমন কথা কোন্ বইতে লেখা আছে? তা ছাড়া বইতে লেখা নেই ব'লে ব্যাধিগুলো কাউকে আক্রমণ করবে না, তেমন যুক্তি সুনন্দা আর মেনে নিতে রাজী নয়। অতএব সে তার মনের স্বাস্থ্যটা এবার ভাল ক'রে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল সুনন্দা। কেবল দীর্ঘ নয়, বোধ হয় এই মুহূর্তে সে জীবনের দীর্ঘতম নিশ্বাসটাই ফেলল। মনের আকাশে অনেক ধোঁয়া। কালো, কুটিল ও করুণাহীন কয়লার কুচিগুলো যেন ওর মনের ফুসফুসে ফুটে রয়েছে। গত দশ বছরের সঞ্চিত কয়লার কুচি আজ বোধ হয় ওর ফুসফুসে সৃষ্টি করেছে অসংখ্য ছিদ্র। ইংরেজ আর মারোয়াড়ীর যৌথ লুণ্ঠনের চটকল-নিঃসৃত

ধোঁয়ার চেয়েও এ ধোঁয়া বেশি কালো। এ নিশ্চয়ই সুনন্দার মনের ফুসফুসের ব্যাধি।

সুনন্দা জানে, মানুষের আর বসবার সময় নেই। নেই তার বিশ্রামের সংক্ষিপ্ত অবসর। জগতের সব কিছু এগিয়ে যাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। গতির মুখে পৃথিবীর আদিম ব্যবস্থাগুলো যেন সব লণ্ডভণ্ড হয়ে ছিটকে পড়ছে পথের এধারে-ওধারে। সুনন্দাই কেবল গত দশ বছর ধ'রে একই ঘরে একই বিছানায় চোখ বুজে প'ড়ে রইল সময় কাটাবার জন্যে। ঘর বাঁধবার প্রয়োজন সে বোধ করে নি। ইঁট-সুরকির ফ্ল্যাট বাড়িগুলোর পাশে সে কোন ঘরই বাঁধতে পারত না। লাবণ্যর "মানসী"-কে সুনন্দা পারত না উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসতে অক্ষর-আস্তীর্ণ 'শেষের কবিতা'র বিলুপ্ত পৃথিবী থেকে। সুনন্দা তাই প'ড়ে রইল সবার পেছনে। অনড় ও গতিহীন মুহূর্তগুলো ওকে কোনদিনই অস্থির ক'রে তুলল না। এগিয়ে যেতে দিল না জীবনের দশটা বছর।

এগিয়ে যেতে চায়ও নি সুনন্দা। এগিয়ে সে যাবে কোথায়? কোন একটা নির্দিষ্ট ঠিকানার সন্ধান যদি সে পেত, তবে হয়তো চলবার ইচ্ছে হ'ত ওর। সুনন্দা বুঝতে পেরেছে, পৃথিবীর মানুষ আজ ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে। কারও আর গন্তব্যস্থলে পৌছবার তাড়া নেই। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে সে চ'লে গেল দশ বছর পেছনে। সবে মাত্র বি. এ. পাস করেছে সুনন্দা। বিধবা মায়ের চেষ্টায় কে একজন ভদ্রলোক সুনন্দাকে বিয়ে করতে রাজী হ'ল। সুনন্দাকে দেখে তার পছন্দ হ'ল খুব। বড় শহরে সে ভাল চাকরি করে। সব দিক দেখে শুনে মা বললেন, কোটিতে এমন একটি পাত্র পাওয়া যায় না সুনন্দা।

কোটিতে যা পাওয়া যায় না, তেমন লোক তো স্বাভাবিক নয় মা। আমি বিয়ে করতে চাই কোটির মধ্যে একজনকে, যাকে চোখে দেখলেই সাধারণ বাঙালী ব'লে চেনা যাবে।—বললে সুনন্দা।

কথা শুনে বিধবা মা একটু বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি পুনরায় বললেন, কোটি বাঙালীর কথা যদি বলিস, তা হ'লে আমরা সবাই মিলে ক্লাইভ স্ট্রীটের প্রতিটি অফিস অমন তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে মরলুম কেন? আর ক'দিন পর ভাল পাত্রের জন্যে বড়বাজারের গলিতে গিয়ে ঢুঁ মারতে হবে। নয়তো ছুটতে হবে মাদ্রাজী-পাড়ায়।

বল কি?—সুনন্দা যেন চমকে উঠল নতুন সংবাদ শুনে, বল কি মা? বাংলা নভেলে তো এমন খবর দেখি না? সেখানে তো দেখছি, নায়কেরা সব অফিসের শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত কামরায় ব'সে কাজ করছে!

তারা বোধ হয় আসল বাঙালী নয় সুনন্দা। ক্লাইভ স্ট্রীটের খবর আমি রাখি।

তা হ'লে ক্লাইভ স্ট্রীটের বাইরে কোথাও খুঁজে দেখতে হবে।—সুনন্দা যেন আলোচনার ওপর উপসংহার টানল।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, সুনন্দা, আমায় সত্যি ক'রে বল্ তো, ক্লাইভ স্ট্রীটের বাইরে কাউকে চিনিস না কি?

না। আমি চিনি কোটি কোটি সাধারণ বাঙালীকে।

সে সব তো বেকার বাঙালী!

বেকারকে উপার্জনক্ষম ক'রে তোলার মধ্যে আমাদের সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে মা। একটা গোটা সমাজকে তো তুমি ফেলে দিতে পারবে না।

তুই বা তাদের ধ'রে রেখে কি করবি সুনন্দা?

একটা নতুন গোলোক সৃষ্টি করব।—সুনন্দা চোখ বুজল মুহূর্তের জন্যে। অনাগত গোলোক সৃষ্টির আনন্দ বোধ হয় ওর সারা অনুভূতিকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল।

মা বললেন, মারাত্মক ভুল করছিস সুনন্দা। এমন সুসম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র ফসকে গেলে আর পাওয়া যাবে না। সব কিছু যেন তৈরি করা আছে। দরজায় ধাক্কা দিয়ে তার ঘরে ঢোকবার পরিশ্রমটুকুই কেবল তোর নিজের মেহনত।

মেহনত আমি করতে চাই। তৈরি-করা ঘরসংসার আমি চাই নে। চাই নে এমন কি তৈরি-মানুষও। জল আর মাটি যদি পাই, তা হ'লে আমি মূর্তি গড়তে পারব।

তুই স্বপ্ন দেখছিস সুনন্দা।

স্বপ্নই বা দেখতে পারছি কই? মা, আমায় তুমি স্বপ্ন দেখতে দাও—আমায় গড়তে দাও আমার সংসার-শিল্প। ক্লাইভ স্ট্রীটের গোলোক আমার মনঃপূত নয়।

বিধবা মায়ের হাত থেকে ক্লাইভ স্ট্রীটের পাত্র ফসকে গেছে দশ বছর আগে।

বড় শহরের আকাশে সূর্য ক্রমশ তেতে উঠছে।

সুনন্দার তবু শীত করছে। সন্ধ্যে পর্যন্ত বোধ হয় ওকে অপেক্ষা করতে হবে না, তার আগেই জ্বর আসবে। বুকের ওপর হাতের উল্টো দিকটা রেখে ও অনুভব করলে, জ্বর সম্ভবত এসেই গেছে। বাড়ির ভৃত্য ধর্মদাসকে ডেকে থার্মোমিটারটা আনিয়ে নিলে কেমন হয়? নাঃ, কোন লাভ নেই, ভাবলে সুনন্দা। জ্বরের জন্যে চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। আসল ব্যাধি হচ্ছে ওর মনের ফুসফুসে। এফেক্ট আর ক্যজালিটি এক নয়। কারণিক বিপর্যয় যখন ওর জানা আছে, তখন ধর্মদাসকে ডেকে এনে জ্বর মাপবার প্রয়োজন নেই। সুনন্দা উঠে গিয়ে পাখার গতিটা একটু কমিয়ে দিয়ে এল। বৈশাখের রোদ আজ ওকে পাখার বাতাসের চেয়ে বেশি আরাম দিচ্ছে।

বিছানায় গড়িয়ে পড়ল সুনন্দা। গড়িয়ে চ'লে গেল আবার সেই দশ বছর পেছনে। সে তখনও বি. এ. পাস করে নি। বড় শহরের কোন্ এক বড় কলেজে সুনন্দা পড়ছে। প্রথম প্রথম সে বসত ক্লাসের প্রথম বেঞ্চিতে। অধ্যাপিকাদের বক্তৃতা টুকে নিত শেখবার আগ্রহ নিয়ে। ক্রমে ক্রমে সুনন্দার বন্ধুসংখ্যা বাড়তে লাগল। ওরা ওকে টানতে লাগল পিছন দিকে। থার্ড ইয়ারের গোড়ার দিকেই সুনন্দা এসে বসল ক্লাসের শেষ বেঞ্চিতে। ডাইনে-

বাঁয়ে তার অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল। অধ্যাপিকাদের কণ্ঠস্বর স্পষ্টভাবে পৌছয় না সুনন্দার কান পর্যন্ত। ক'টা দিন সে ওখানে ব'সে কেবল হাই তুলতে লাগল। তার পর ললিতা আর দীপ্তি দু পাশ থেকে দুখানা চিঠি দিলে সুনন্দার সামনে খোলা-বইটার পাতার ভাঁজে ঢুকিয়ে। শেষের বেঞ্চিতে ব'সে সুনন্দা পড়তে লাগল অপরের কাছে লেখা প্রেমপত্রের হাজার হাজার অক্ষর। দু-চার দিন পর সুনন্দার আর চিঠি পড়বার দরকার হ'ল না। একই ভাষা, একই বক্তব্য, একই প্রতিশ্রুতি প্রতিটি চিঠির ছত্রে ছত্রে। মাঝে মাঝে সুনন্দার মনে হ'ত, চিঠিগুলো যেন কার্বন দিয়ে একই সঙ্গে টাইপ ক'রে রেখেছে। কেবল যথাস্থানে পৌছে দেবার মেহনতটুকুই ছেলেদের নিজের।

ফোর্থ ইয়ারের শেষের দিকে সুনন্দা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। পরিশ্রান্ত হ'ল ললিতা এবং দীপ্তিও। পরীক্ষায় পাস করতে পারবে না ব'লে ললিতা দিল কলেজ ছেড়ে। একদিন ললিতা এল সুনন্দার ঘরেই। ঘোষণা করলে সে, আমি পালিয়ে যাচ্ছি।

কোথায়?—জানতে চাইল সুনন্দা।

নিউইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস—দেশ দেখব। দেখব মানুষও।

টাকা?

এই মাত্র বাবা মারা গেলেন।

এই মাত্র মানে কি ললিতা?

ঘণ্টা পাঁচেক আগে। অ্যাটর্নী শ্যাম দত্তের অফিস ঘুরে এলুম। আমার নামে বাবা দু লাখ টাকা ফেলে গেছেন লয়েডস ব্যাঙ্কে। এখন কেবল আমার চেক কাটবারই যা মেহনত।—ললিতা শুয়ে পড়ল সুনন্দার বিছানায়। কেবল শুয়ে পড়ল না, সে গড়াতে লাগল বিছানার এ-কিনারা থেকে ও-কিনারা পর্যন্ত। ইচ্ছে ক'রেই যেন ললিতা শাড়িটা তার এলোমেলো করতে লাগল। বোধ হয় ও সুনন্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। ললিতা কিছুই লুকোতে

চায় না। সুনন্দা ভাবলে, মুখচন্দ্রিকার বহু-প্রতীক্ষিত রোমাঞ্চের অন্তহীন উপলব্ধির স্বপ্ন এ-যুগের ললিতারা আর কোনদিনও দেখতে চাইবে না।

বিছানায় উঠে বসল ললিতা। জিজ্ঞাসা করলে, হাঁ ক'রে কি দেখছিস সুনন্দা?

ফর্ম্।

গরম দেশের প্রাকৃতিক উৎপাত তো কম নয়। বিনিময়-বাহুল্য না থাকলেও ফর্ম্ যায় ঢিলে হয়ে। ভাবছি সুইট্জারল্যাণ্ডের পাহাড়ে গিয়ে ঘর বাঁধব। তুই কি করবি সুনন্দা?

পরীক্ষা দেব।

কি পরীক্ষা?

বি. এ. পরীক্ষা।

কি হবে এসব খেলো পরীক্ষা পাস ক'রে?

জীবনের বড় পরীক্ষাগুলো উত্তীর্ণ হবার জন্যেই খেলো পরীক্ষাগুলোতে আমি ফাঁকি দিতে চাই নে ললিতা। তা ছাড়া উনিশ বছর বয়সের পক্ষে বি. এ. পরীক্ষাটা খুব খেলো নয়। যাক, আমার কথা ছেড়ে দে। পালিয়ে যাচ্ছিস একা, না, জয়ন্তর সঙ্গে?

সোজাসুজি তক্ষুনি উত্তর দিল না ললিতা। শিস দিয়ে সুর তুললে: প্রিয় তোমার কাছে যে হার মানি ইত্যাদি। পুরো কলিটা শিস দিয়ে শেষ করবার পর সে বললে, গানের মানে যা-ই হোক, জয়ন্ত আমার কেউ নয়। দুটো বছর আমার গোল্লায় গেল।

আর কিছু যায় নি ললিতা?—জিজ্ঞাসা করল সুনন্দা।

এলোমেলো শাড়িটা গুছিয়ে নিয়ে ললিতা এগিয়ে এল সুনন্দার দিকে। আগের প্রশ্নটার কোন উত্তর না দিয়ে বললে, পরশুদিনই রওনা হব। যাচ্ছি বি. ও. এ. সি.র উড়ো-জাহাজে। বিজ্ঞানের প্রগতি সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নেই, কিন্তু উড়ো-জাহাজের প্রতি ঘণ্টার গতি আমার জানা আছে।

ভেবে দেখ্‌ সুনন্দা, ভারতবর্ষের মাটির সীমা অতিক্রম করতে আমার তিরিশ মিনিটও লাগবে না! উড়ো-জাহাজের প্রথম অবতরণ কালাঙ্গ বিমান-ঘাঁটিতে।—দরজার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে ললিতা থেমে গেল হঠাৎ। তারপর সহসা সুনন্দার মুখের ওপর একটা চুমু বসিয়ে দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, এখনও কাউকে ভালবাসিস নি ?

বাসবার চেষ্টা করছি। কোন কিছু গ'ড়ে তুলতে আমার ভাল লাগে।

আমার ভাল লাগে রেডী-মেড জিনিস। এটা মহাযুদ্ধের শতাব্দী—র'য়ে-ব'সে থেমে-থুমে কোন কিছু করতে গেলে, হয়তো আর করাই হবে না। তা ছাড়া, পুরুষ মানুষদের নিয়ে সত্যিই কিছু গড়বার নেই সুনন্দা। ওরা কোন-দিনই মানুষ হবে না—ওরা জন্তু।

দরজার ওপাশে গিয়ে ললিতা ঘোষণা করলে, একা যাচ্ছি না। জয়ন্তর বদলে সঙ্গে একটা জন্তু নিয়েছি। জন্তু পিটিয়ে মানুষ করবার মধ্যে তোর আর যাই থাক্‌, জীবনদর্শন নেই। তুই কষ্ট পাবি সুনন্দা।

দরজার ওপাশ থেকে ললিতা চ'লে গেছে আজ প্রায় দশ বছর হ'ল। দশ বছর !

বড় শহরের সূর্য খুব গরম হয়ে উঠেছে।

বেলা বোধ হয় দশটাই বাজে। চা খাবার জন্যে ধর্মদাস এখনও দরজায় টোকা মারে নি। ভালই হয়েছে। আজ আর সুনন্দা বিরক্ত হতে চায় না। চা খাওয়ার জন্যে ডাকাডাকি করলে সুনন্দা হয়তো আজ আর দরজা খুলবে না। সন্ধ্যে পর্যন্ত সে ঘুমুতে চায়। সন্ধ্যের পর না হয় থার্‌মোমিটার লাগিয়ে দেহের উত্তাপ মেপে নেবে। হঠাৎ ওর গলার মধ্যে কেমন একটা সুড়সুড়ি দিয়ে উঠল। ভেতর থেকে যেন একটা কাশির ঢেউ উঠল। মুখ বন্ধ ক'রে সে কাশিটা চাপবার চেষ্টা করতে লাগল প্রাণপণে। বেশিক্ষণ চেপে রাখতে পারল না সে। চান-ঘরে ছুটে এল সুনন্দা। দেওয়ালের গায়ের কলটা খুলে

দিল তাড়াতাড়ি ক'রে। জলের স্রোতে রক্তটা ধুয়ে গেলেই ভাল। ধুয়ে গেলও।

বিছানায় শুয়ে সে বেশ একটু দুর্বল বোধ করতে লাগল। ভেতরের ক্ষয় আর বোধ হয় পূরণ হয়ে উঠবে না। প্রোটিনের আধিক্য পারবে না ওর মনের ফুসফুসকে জোড়া লাগাতে। সুনন্দা আবার ফিরে গেল দশ বছর পেছনে।

অ্যাটর্নী শ্যাম দত্ত ছিলেন সুনন্দার বাবার বাল্যবন্ধু। আত্মীয়ের চেয়েও বড় ছিল শ্যাম দত্তর গোটা পরিবার। দুই পরিবারের মধ্যে যাওয়া-আসার দরজাটা সব সময়েই খোলা থাকত। শ্যাম দত্তর বড় ছেলে শেখরও যাওয়া-আসা করত এই খোলা দরজা দিয়ে। সুনন্দা ও শেখরের মধ্যে বয়সের তফাত ছিল মাত্র এক বছরের। সুনন্দা যখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ছে, শেখর তখন এম. এ. ক্লাসের ছাত্র। কিন্তু শেখর সুনন্দাকে ভালবাসত কলেজে ঢোকবার আগে থেকেই।

এম. এ. ক্লাসে পড়বার সময়েই শেখর একদিন সুনন্দার কাছে প্রস্তাব করল।

আমি আর অপেক্ষা করতে রাজী নই। তোমার আপত্তি না থাকলে গুরুজনদের কাছে কথাটা খুলে বলি।

কোন্ কথাটা ?—জিজ্ঞাসা করল সুনন্দা।

বিয়ের কথা।

এত তাড়াতাড়ি ?—সুনন্দা যেন তার স্বপ্নের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে শেখর-গর্তে স্খলিত হয়ে পড়ল। শেখর আজ মনে মনে তৈরি হয়ে এসেছে, সুনন্দাকে আজ কোন রকম গর্তেই প'ড়ে যেতে কিংবা পালিয়ে যেতে দেবে না। সুনন্দা অনেক দিন ধ'রেই স্বপ্ন দেখছে—দেখছে ছেলেবেলা থেকেই।

শেখর বললে, তুমি স্বপ্ন দেখ, তাই তোমার বয়স বাড়ে না। কিন্তু আমার—

হঠাৎ থেমে গেল শেখর। ওর বোধ হয় মনে হ'ল যে, একজন যুবতীর শয়ন-কামরায় ব'সে বয়সবৃদ্ধির সন্দেশ বিতরণে আর যাই থাক্, রুচি নেই। শেখর জানে, সুনন্দার রুচিবোধ ওর কুমারী-জীবনের মতই চতুর্দিকের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত। কেবল সুরক্ষিতই নয়, মন ও দেহের সবটুকু স্বত্বই ওর নিজের

কপিরাইটের আইন দ্বারা সংরক্ষিত। কিন্তু বয়সের ব্যাপারটা সুনন্দা আজ নিজের থেকেই তুলল। সে জিজ্ঞাসা করলে, আমার তো বয়স বাড়ে নি, কিন্তু তোমার?

আমার? ধমনী-মুখে রক্ত-সংবহনের বদলে সংবাহিত হচ্ছে গলা-ইস্পাত। পেশীর খবর না-ই বা শুনলে।—রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে শেখর বললে, ব্রতচারিণীর মত অপেক্ষা করবে কার জন্যে? নষ্ট সময় আর উদ্ধার করতে পারবে না। পারবে না বাঁচিয়ে রাখতে তোমার স্বপ্নের স্নায়ুতন্ত্র।

শেখর, জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনার পেছনে যদি প্রস্তুতি না থাকে, প্রতীক্ষা না থাকে, তবে তা সুন্দর হয় না। সাইন-বোর্ড টাঙিয়ে টেবিল চেয়ার নিয়ে ক্লাইভ স্ট্রীটে একটা অফিস খুলতে যা সময় লাগে, তার চেয়েও আজকাল কম সময় লাগে স্ত্রীপুরুষের মিলন-কাব্যের অফিস সাজাতে। শেখর, বিয়েটাকে আমি কিছুতেই টেক্‌নোলজির স্তরে নামতে দেব না। তোমার ও আমার সম্বন্ধটা ক্রমশ গ'ড়ে উঠুক। পার হোক দুঃখ-কষ্টের চড়াই-উৎরাই। আমরা যদি সত্য পথ ধ'রে চলি, তবে পরিণতির জন্যে কোন আশঙ্কাই থাকবে না।

আশঙ্কা থাকবে না—তেমন কথা জোর ক'রে বলা চলে কি?

কেন, তুমি বুঝি অপেক্ষা করতে রাজী নও?—জিজ্ঞাসা করল সুনন্দা।

ঠিক তা নয় সুনন্দা। তবে—

তবে কি? বড় শহরের সামাজিক-সংবর্তে ডুবে যাওয়ার ভয় তোমার আছে আমি জানি। কিন্তু আমার তাতে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নেই শেখর। আমি তোমার জন্যে চিরদিন অপেক্ষা ক'রে থাকব। বাত্যা-বিক্ষুব্ধ জীবন-সমুদ্রে যদি ডুবে না যাও, তবে সুনন্দা-বন্দরে আশ্রয় তুমি পাবেই।

মাথা নীচু ক'রে শেখর কি যেন ভাবছিল। সুনন্দা-বন্দরের খবরটা বোধ হয় ওর কানেও গেল না। শেখর সম্ভবত এরই মধ্যে বাত্যা-বিক্ষুব্ধ জীবন-সমুদ্রে ভাসছে।

নিঃশব্দে শেখর সুনন্দার ঘর থেকে চ'লেই যাচ্ছিল। বোধ হয় গলা-

ইস্পাতের ধাক্কায় সে ফিরে এল সুনন্দার কাছেই। ফস ক'রে সে সুনন্দাকে টেনে নিল বুকের ওপর। তারপর নিজের মুখটা নীচু করতে গিয়ে শেখর বুঝতে পারল, সুনন্দার দৈহিক শক্তিও ওর নিজের চেয়ে বেশি কম নয়। শেখরের বাহুবন্ধন থেকে সুনন্দা নিজেকে অতি সহজে মুক্ত ক'রে নিয়েছে। ধীরে ধীরে সুনন্দা বললে, তুমি রাগ করবে জানি। কিন্তু তোমাকে বাধা দেওয়া ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না শেখর। নিজেকে আমি তৈরি করছি কেবল তোমার জন্যেই। বিশ্বাস ক'রো, যেদিন তোমাকে আমি দেব তার মধ্যে এক রত্তিও ভেজাল থাকবে না। তা ছাড়া সংযমের মধ্যে কেবল শুচিতাই নেই, আছে সম্ভোগের সৌন্দর্য।—এই ব'লে সুনন্দা নিজেই গিয়ে ভেজানো দরজাটা খুলে দিয়ে এল। গলা-ইস্পাতের বিপরীত ধাক্কায় শেখর যেন গড়িয়ে পড়ল দুতলা থেকে একতলায়। দুটো ক'রে সিঁড়ি একসঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে শেখর নেমে গেল নীচে, চ'লে গেল সুনন্দার বাড়ি থেকে। সুনন্দা ভাবলে, আবার যেদিন শেখর ওপরে উঠবে, সেদিন ওর পদক্ষেপে থাকবে না পালিয়ে যাওয়ার লজ্জা।

কিন্তু দশ বছর হয়ে গেছে শেখর আর ফিরে আসে নি।

অ্যাটর্নী শ্যাম দত্ত নেই, মারা গেছেন। ম'রে আছে সমস্ত পরিবারটা। দত্ত-বংশের একমাত্র ছেলে শেখর দত্তের কোনও খবর কেউ জানে না আজ দশ বছর হ'ল।

বড় শহরের সূর্য থেকে আগুন ঠিকরে পড়ছে।

জানলাটা বন্ধ করবার ইচ্ছে হ'ল না সুনন্দার। রোদ আসুক, আসুক আগুন। স্ফুটনাঙ্ক-স্পর্শী আগুনের তাপে বীজাণুগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যাক। তার পর ব্যাধিযুক্ত দেহটা ক্রমে ক্রমে একদিন সুস্থ হয়ে আসবে।

সুস্থ হওয়ার লোভ সুনন্দার বড় কম নয়। ওর বিশ্বাস, শেখরও একদিন সুস্থ হয়ে ফিরে আসবে। ফিরিয়ে আনবে সুনন্দাই। শেখরকে গ'ড়ে তোলবার

জন্যে সুনন্দা তার সবটুকু প্রযত্ন ও প্রতিভা নিয়োগ করেছে। শেখরের ছবি সুসম্পূর্ণ হয়েছে শিল্পী-সুনন্দার তুলির আঁচড়ে। জীবন থেকে সবটুকু রঙ নিঙড়ে নিয়ে খরচ ক'রে ফেলেছে তুলির মুখে। পুরোপুরি দিতে না পারলে পুরোপুরি পাওয়া যায় না ব'লেই সুনন্দার বিশ্বাস। দশ বছরের প্রতীক্ষা হয়তো ওর ব্যর্থ হবে না।

ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। ধর্মদাসের গলা শোনা গেল। প্রতিদিনকার মত আজও সে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। সুনন্দার ইচ্ছে হ'ল না দরজা খুলতে। চা-খাওয়া নেশার চেয়ে আজ ওকে বড় নেশায় পেয়ে বসেছে। সফল স্বপ্নের আনন্দে সুনন্দা যেন হাবুডুবু খাচ্ছে। সে পেরেছে শেখরকে ধ'রে রাখতে। শেখর পারে নি পালিয়ে যেতে ওর স্বপ্নের জগৎ থেকে।

তিলে তিলে দেওয়ার গর্ব আজ ওর অনেক।

দিদিমণি, একটা চিঠি আছে।—ধর্মদাসের ঘোষণায় সুনন্দা বিন্দুমাত্র আগ্রহান্বিত হ'ল না। বিছানায় শুয়েই সে জবাব দিলে, চিঠি আমি চাই নে। উনোন ধরাতে তোর কাজে লাগবে ধর্মদাস।

চা খাবে না?—বাইরে থেকেই প্রশ্ন করল ধর্মদাস।

না, আমায় বিরক্ত করিস নি।

দিন দুপুরে শুয়ে শুয়ে কি স্বপ্নই যে দেখছ তুমি দিদি! চিঠি তোমার এখানেই প'ড়ে রইল।

সুনন্দা বুঝলে, ধর্মদাস সত্যি সত্যি দরজার বাইরেই চিঠিখানা ফেলে চ'লে গেল। একটু পরে সুনন্দার মনে হ'ল, দরজার বাইরে কে যেন অপেক্ষা করছে। ঘরে ঢোকবার জন্যে কে যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ব'লে সুনন্দার বিশ্বাস জন্মাল। কে জানে, হয়তো চিঠিখানার পা গজিয়েছে।

ইচ্ছে ছিল না, তবু সে বিছানা ছেড়ে উঠল। এলোমেলো শাড়ি গুছিয়ে নিল ভাল ক'রে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াতে লাগল

সুনন্দা। তার পর চুলগুলো টেনে টেনে বেশ মনোযোগ দিয়ে খোঁপা বাঁধল, সেই সঙ্গে বেঁধে রাখতে চাইল হারিয়ে-যাওয়া দশটা বছর।

সুনন্দা দরজা খুলল। ডাইনে বাঁয়ে চেয়ে দেখলে, কেউ কোথাও নেই। মেঝের ওপর প'ড়ে আছে একটা চিঠি। চিঠিখানা হাতে নিয়ে সে ফিরে এল ঘরে। চিঠি এসেছে ললিতার কাছ থেকে। লিখেছে লণ্ডন থেকেই। চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল সুনন্দা :

সুনন্দা, হিসেব ক'রে দেখিস এর মধ্যেই দশটা বছর পেরিয়ে গেছে। মনে হয়, এই দশ দিন আগে তোর সঙ্গে দেখা ক'রে এলুম! বিজ্ঞানের কি আশ্চর্য ক্ষমতা, দশ বছরের ব্যবধানকে দশ দিনের মধ্যে এনে সঙ্কুচিত ক'রে ফেলতে পারে! সর্বত্রই সবাইকে গতির নেশায় পেয়ে বসেছে। গোটা পৃথিবীটাই দশ বছরের কাজ দশ দিনে শেষ করবার জন্যে চেষ্টা করছে। সময়টা বড্ড তাড়াতাড়ি ক্ষ'য়ে যাচ্ছে। আমার আসল বয়েস আটাশ, মনে হয় সেঞ্চুরি পার হয়ে গেছি।

কেমন আছিস? ছেলেপুলে ক'টি? মানে, স্বামী নিশ্চয়ই তোর আছে—সেটা ভেবে নিয়েই বলছি। আমি তো দশ বছরে তিনবার বিয়ে করেছি। তিনবারই ভেঙে গেল। ভগবান রক্ষে করেছেন, তিনটির মধ্যে একটিও বাঙালী নয়। বাঙালীগুলো কেঁচোর মত লেগে থাকে। কেঁদে ককিয়ে, প্রেমপত্র এবং কবিতা লিখে লেগে থাকবার কৌশল ওরা ছাড়া আর কেউ জানে না। তেমন একটি নদের নিমাই আমার সঙ্গে জুটে পড়েছিল কলকাতা থেকে। সেই খবর তুই জানিস। প্রথম তিনটে বছর আমার নষ্ট করেছে সেই ভদ্রলোকটি। সোজাসুজি খুন করা পাপ, নইলে কাসাব্লাঙ্কায় সুযোগ পেয়েছিলুম আপেলের মধ্যে পটাসিয়াম সাইনাইড মিশিয়ে দেওয়ার।

ব্যাপারটা খুবই সহজ ছিল। আমরা যে হোটেলটায় ছিলুম, সেটায় ইউরোপের ধনপতিরাই প্রধানত এসে থাকেন। একদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে কামরার বাইরে এলুম। ভোরের আকাশ দেখতে আমার ভাল লাগত। হঠাৎ আমার পাশের কামরার দিকে নজর পড়তেই দেখি যে, দরজাটা খোলা,

খাটের ওপর একটি যুবতী মেয়ে শুয়ে আছে; কিন্তু ভঙ্গিটা খুব অস্বাভাবিক ব'লে মনে হ'ল। ভেতরে গেলাম।

হাত দিয়ে একটু ঠেলা দিতেই বুঝলুম, মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে। বিছানার ওপর গোটা দশ-বারো পুরুষের ছবি প'ড়ে রয়েছে। ছবিগুলোর মধ্যে একটা ছোট শিশুও আছে লক্ষ্য করলুম। শিশিটার গায়ে একটা লেবেল লাগানো। তাতে লেখা রয়েছে—পটাসিয়াম সাইনাইড। সবটুকু খায় নি মেয়েটি। শিশিতে আরও অনেকটা ছিল। মুহূর্তের মধ্যে আমিও যেন মনে মনে একটা প্ল্যান ঠিক ক'রে ফেললুম। টেবিলের ওপর আধখানা আপেলও প'ড়ে ছিল। আপেলের মধ্যে যদি একটু সাইনাইড মিশিয়ে—মানে অসম্ভব লোভ হ'ল নদের নিমাইকে বিদায় করবার জন্যে। সুনন্দা, তুই বোধ হয় জানিস না, শেখর দত্ত আপেল খেতে বড্ড ভালবাসত! সব পুরুষই বোধ হয় বাসে।

তার পর শেখরের সঙ্গে আমার সাত বছর দেখা হয় নি। সেদিন আমি গিয়েছিলুম আমার অ্যাটর্নী মিঃ মর্গানের সঙ্গে দেখা করতে। ছ'তলার ওপরে তাঁর অফিস। লিফ্‌টে ক'রে যখন ওপরে উঠছিলুম, তখন হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা হ'ল শেখরের। শেখর আমায় চিনতে পারে নি, কিন্তু আমিই শেখরকে চিনলুম। শেখর লিফ্‌ট্‌ম্যান।

সব খবরই নিলুম। শেখর বিয়ে করে নি, ব্যয় করে নি স্বাস্থ্য। শেখর দত্তকে দেখলে মনে হয়, ত্রিশ বছরের সব ক'টি বছরই ওর গায়ের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে। সুপুরুষ এই ফ্লিট স্ট্রীটের লিফ্‌ট্‌ম্যান শেখরনাথ দত্ত।

আমি আর লোভ করব না সুনন্দা। লোভ করবার মত বলিষ্ঠতা আর আমার নেই। আমি এখন বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করছি। নতুন নতুন ওষুধের বিজ্ঞাপন পড়া আমার প্রতিদিনের সবচেয়ে বড় পাঠ।

গত কাল লিফ্‌ট্‌ম্যান শেখর দত্তকে জাহাজে তুলে দিয়ে এলুম। ভারতবর্ষে ফিরে যেতে আমি তাকে বাধ্য করলুম। টিকিটের ভাড়া যোগালুম আমিই। রওনা হবার আগে শেখর এসেছিল আমার ফ্ল্যাটে। আমি চেয়ে ছিলুম ওর

বুকের ছাতির দিকে। বেশ চওড়া ছাতি। পুরনো কোটের ছাতি ফেটে ওর মাংসপেশী প্রায় বেরিয়ে আসার উপক্রম! ইস্পাতের মত শক্ত ওর মাস্‌ল্‌-ফাইবার।

সুনন্দা, আমার সামনে দাঁড়িয়ে শেখর কি করল জানিস? ওর ওই ইস্পাত হৃদয়ের মধ্যে শেখর লুকিয়ে রেখেছিল একটা দশ বছরের পুরনো ফোটো। যাওয়ার আগের মুহূর্তে, আমি ভেবেছিলুম, ও আমায় একটু আদর ক'রে যাবে। বাকি জীবনটা হয়তো আমি এই আদরটুকু ধ'রে রাখতে পারতুম। কিন্তু শেখর তার ভেতরের পকেট থেকে টেনে বার করল একটা ফোটো। আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ফোটোর ওপর চুমু খেল একবার। The unkindest cut of all! ফোটোটা কার জানিস? জবাব চাই নে। ইতি ললিতা।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে সুনন্দা চেয়ে রইল আকাশের দিকে। বৈশাখের আকাশ। জ্যোৎস্না-প্লাবিত আকাশের প্রতি লোভ নেই সুনন্দার। উত্তপ্ত সূর্যালোক ধ'রে রাখবে ওর জীবনের বলিষ্ঠতা। মনের ফুসফুস থেকে উবে যাবে ব্যাধি-বীজাণু। সুনন্দা জানে, দুঃখকষ্টের সূর্যালোকে অবগাহন না করলে গ'ড়ে তুলতে পারত না সে তার স্বপ্নের গোলোক।

জান্‌লার কাছে এগিয়ে গেল সুনন্দা। সে দেখতে পেল বাত্যা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র উত্তীর্ণ হচ্ছে ফ্লিট স্ট্রীটের লিফ্‌ট্‌ম্যান শ্রীশেখরনাথ দত্ত।

সুনন্দা-বন্দরে আলো জ্বলল। সেখানে আজ অনেক আলো।

'তরুণের স্বপ্ন'
বৈশাখ ১৩৬১

শশাঙ্ক গুপ্তের সাম্রাজ্য বিস্তার

সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের যুগ আর নেই। নেই তাঁর প্রাচীন ভারতবর্ষ। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে শশাঙ্ক গুপ্তের যুগ শুরু হয়েছে উনিশ শো উনচল্লিশ সনে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম বছর থেকে। শশাঙ্ক গুপ্তের সাম্রাজ্যে প্রাচীন কালের মত রাজা-প্রজার দ্বন্দ্ব নেই, শাসন-বিচারের বালাই নেই, পথে ঘাটে রক্তপাতের সম্ভাবনাও নেই—আছে শুধু টাকার হিসেব।

ভারতবর্ষের ব্যাঙ্কে তাঁর অনেক টাকা। ভারতবর্ষের বাইরের ব্যাঙ্কে তাঁর প্রচুর পাউণ্ড, লক্ষ ডলার, নিযুত ফ্রাঙ্ক, কোটি মার্ক, অর্বুদ লিরা। নেই কেবল তাঁর রুবলের সংস্থান।

ছোট রাসেল স্ট্রীটে তাঁর প্রকাণ্ড বাড়ি। ভারতবর্ষের অনেকগুলো বাড়ির মধ্যে তিনি এইটেতেই থাকেন, থাকতে ভালবাসেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে তিনি ছিলেন নফর কুণ্ডুর স্মৃতি আঁকড়ে, গলির মধ্যে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা লুকিয়ে থাকবার মত একটা ঘরে। ঘর? বোধ হয় ঘরই হবে। আজ আর সে কথা শশাঙ্কবাবুর মনে পড়ে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার এক বছরের মধ্যেই তিনি চ'লে এলেন ছোট রাসেল স্ট্রীটে, নিজের বাড়িতে। তিন লাখ টাকা দাম দিয়ে তিনি কিনলেন বাড়ি। আরও এক লাখ ফেলে তিনি সাজিয়ে-গুছিয়ে নিলেন বাড়িটাকে। তিনতলায় নিজের জন্যে একটা মস্তবড় ঘর তুলেছেন শশাঙ্কবাবু। খরচ করেছেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। এত টাকা হাতে পেয়ে তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করতে পারতেন, ইচ্ছে করলে হিটলারকেও ভুলে যেতে পারতেন। কিন্তু কৃতজ্ঞতাবোধ তাঁর আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে শোবার ঘরের বড় দেওয়ালে। ভারতবর্ষের এক প্রসিদ্ধ শিল্পীকে দিয়ে অজন্তার টেক্‌নিকে তিনি প্রাচীরচিত্র আঁকিয়েছেন। সমস্তটা দেওয়াল জুড়ে জার্মানির কোন এক পার্বত্য অঞ্চলের ছবি; ছবিটার মাঝখানে সামরিক পোশাক প'রে

দাঁড়িয়ে আছেন হের হিটলার। শশাঙ্কবাবুর বিশ্বাস, হিটলারের সঙ্গে তাঁর ভাগ্যের যোগাযোগ না থাকলে, তিনি কিছুতেই ছোট রাসেল স্ট্রীটে প্রবেশ করতে পারতেন না।

দোতলার ব্যবস্থা তিনতলার মত নয়। ছোট বড় মিলিয়ে আঠারোটা ঘর। শশাঙ্কবাবুর স্ত্রী শোভা দেবী এরই একটায় থাকেন।

দশ বছর নফর কুণ্ডু লেনে বসবাস করবার পর তাঁর আর বাতাসের দরকার হয় না। কাঠ হাঁপানিতে ভুগে ভুগে তিনি শুকনো বাঁশপাতার মত হালকা হয়ে গেছেন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি শশাঙ্কবাবুর ইহলোকের সুখসমৃদ্ধি নিরীক্ষণ করেন। কিন্তু অংশ নিতে পারেন না তার উপভোগ-আয়োজনে। নফর কুণ্ডু দম আটকে মারা গিয়ে মুক্তি পেয়ে গেলেন, অথচ শোভা দেবী নফর কুণ্ডুর গলিতে দমটুকু রেখে এসেও মুক্তি পাচ্ছেন না।

আজকাল শশাঙ্কবাবু স্ত্রীর কাছে কিছুই প্রত্যাশা করেন না। প্রথম জীবনে স্ত্রীর কাছে গহনা চেয়েছিলেন, শোভা দেবী তাঁর শেষ ভরিটুকু পর্যন্ত শশাঙ্কবাবুর হাতে তুলে দিতে কার্পণ্য করেন নি। দশ বছর পর শশাঙ্ক গুপ্ত যখন গাড়ি ভরতি ক'রে পুনরায় গহনা নিয়ে ফিরে এলেন, তখন শোভা দেবীর হাঁপানি শুরু হয়ে গেছে। কোন রকম ভারী জিনিস শরীরে রাখতে পারেন না।

স্ত্রীর কাছে তিনি সন্তান চেয়েছিলেন। তাও তিনি পেয়েছেন। দুটি ছেলে, একটি মেয়ে। যুদ্ধ যখন শুরু হয়, বড় ছেলে সুজিতের বয়স তখন দশ। শশাঙ্কবাবুর স্পষ্ট মনে আছে, যেদিন তিনি ওদের নিয়ে ছোট রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে প্রবেশ করেন সেদিন তাঁর বড় ছেলে সুজিত প্রথম দৌড়তে শিখল। বাড়ির সামনে মস্ত বড় বাগান, সুজিত ছুটছে তো ছুটছেই। আর যেন সে থামতেই চায় না। ছোট দুটি ভাইবোন অবাক হয়ে চেয়ে ছিল ওর দিকে। ওরা গাড়ি-ঘোড়া ছুটতে দেখেছে, মানুষকে অমন ভাবে ছুটতে দেখে নি। নফর কুণ্ডু লেনে ওরা হামাগুড়ি দিয়েছে, কিন্তু ছুটতে পারে নি। বাগানের

মধ্যে প্রবেশ করবার পর ছোট মেয়ে রমা প্রশ্ন করলে, বাবা, বাড়ির মধ্যে এত জঙ্গল কেন ?

জঙ্গল নয় মা, ফুলের গাছ।—মুচকি হেসে জবাব দিলেন শশাঙ্কবাবু।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। সৈন্যসামন্ত যা মরবার মরল। যার যা ক্ষতি হওয়ার তা হ'ল। কিন্তু শশাঙ্ক গুপ্তর ভাগ্য-বালার্ক সেই যে মধ্যগগনে উঠে ব'সে আছে, তার আর পশ্চিম দিকে ঢ'লে পড়বার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-কারখানা তাঁর প্রতি বছর বেড়েই চলেছে।

শশাঙ্কবাবু একদিন তাঁর স্ত্রীকে বললেন, আমার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত। পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরতে হবে আমায়। যাওয়ার আগে খসড়াটা তোমায় শুনিয়ে যেতে চাই।

বল, আমি শুনছি।

শশাঙ্কবাবু পকেট থেকে তাঁর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটা ফর্দ বার করলেন—ব্লু-প্রিণ্ট। ফর্দর দিকে চোখ রেখে তিনি বলতে লাগলেন, ভারতবর্ষের সব কটি বড় বড় শহরে আমার বিষয়-সম্পত্তির ওপর মোট লগ্নি হবে বিশ লক্ষ টাকা। এই বিভাগটি পরিচালনা করবেন বিকাশবাবু। তিনি সৎ ও সাধু ব্যক্তি। অভাব থাকলে সৎ ও সাধু ব্যক্তিও চুরি করতে পারেন। আমি তাই তাঁর মাইনে ঠিক করেছি মাসিক পাঁচ শো টাকা। পাঁচ বছরের শেষের দিকে দু হাজার টাকা হবে। যে কোন প্রাদেশিক মন্ত্রীর চেয়ে বেশি মাইনে। কি বল ?

শোভা দেবী কিছুই বললেন না, কেবল চেয়ে রইলেন স্বামীর দিকে। শশাঙ্কবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলেন ধীরে ধীরে। একটু পরে তিনি পুনরায় বলতে আরম্ভ করলেন, পুরো ব্যবসাটা দেখবেন মিস্টার ভবানী দত্ত—গুপ্ত লিমিটেডের বড় ম্যানেজার। বিলেতী-ডিগ্রীওয়ালা লোক। উপস্থিত মাইনে তাঁর দু হাজার, বাড়তে বাড়তে পঞ্চম বৎসরের শেষের দিকে

মাসিক মাইনে হবে তাঁর পাঁচ হাজার টাকা। আমার কর্মচারীরা কেউ যেন একটা আধলাও চুরি না করে, সেইজন্যেই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কোনও দারিদ্র্যই আমি রাখলুম না। শোভা, আমার সাম্রাজ্যে চোর থাকবে না, আর থাকবে না অভাব।

দক্ষিণ দিকের দরজাটা বন্ধ ছিল। শশাঙ্কবাবু সেটা খুলে দিয়ে বললেন, বাতাস আসুক। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও শীতল বাতাসের অভাব এখানে কোন-দিনই হবে না।

লম্বা লম্বা পা ফেলে তিনি ঘরটার দক্ষিণ কোণা পর্যন্ত হেঁটে গেলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি গুনতে লাগলেন জানলার মোট সংখ্যা। ঘরখানায় ষোলটা জানলা আছে। ইচ্ছে হ'ল তাঁর, শোভা দেবীর ঘরের সবগুলো জানলাই খুলে দেন। খুলে দিয়ে নফর কুণ্ডু লেনের ওপর প্রতিশোধ নেন।

তিনি ফিরে এলেন শোভা দেবীর কাছে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফর্দটা নাড়াচাড়া করতে করতে তিনি বলতে লাগলেন, এ বাড়িতে বয়-বাবুর্চী, চাকর-দারোয়ান এবং মালীর সংখ্যা আঠারো। প্রত্যেকের মাইনে শুরু হয়েছে ষাট টাকা থেকে, শেষ হবে দেড় শোতে। দু সের মাছ কিনে এরা আড়াই সেরের দাম আদায় করবে না, বাবুর্চীর ইচ্ছে হবে না লুকিয়ে লুকিয়ে কোর্মা-কারি খাওয়ার। শোভা, ছোট রাসেল স্ট্রীটের কোথাও কি তুমি অভাব দেখতে পাচ্ছ?

সব অভাবটাই বোধ হয় চোখে দেখা যায় না।—বললেন শোভা দেবী।

শশাঙ্কবাবু বললেন, ওসব ভাবপ্রবণতার কথা আমার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থান পায় নি। সুজিত অর্থবিদ্যা নিয়ে এম. এ. পড়ছে। পাস করলেই ও বিলেত চ'লে যাবে। অজিত আসছে বছর বি. এস-সি. পাস করবে। তার পর সেও যাবে বাইরে। পাঁচ বছর পর অজিত ইঞ্জিনীয়ার হয়ে ফিরে আসবে দেশে। রমার জন্যে ভাবনা কি? আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে

যদি একটাও জোয়ান মর্দ মন্ত্রী জন্মায়, তবে সেই জনৈক মন্ত্রী হবে রমার স্বামী। ভারত সরকার থেকে সে যা মাইনে পাবে, তার ওপরে আমি তাকে দেব মাসিক পাঁচ হাজার টাকা। গানবাজনা, খেলাধুলো এবং লেখাপড়ায় রমা আমার অদ্বিতীয়া—খণ্ডিত বাংলায় ওর জুড়ি নেই কেউ। বারোজন শিক্ষক আসেন এ বাড়িতে জ্ঞান ও গুণের পোর্টফলিয়ো আর বাদ্যযন্ত্র হাতে নিয়ে। আমার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় লক্ষ্মী-সরস্বতী দু বোনই রইল বাঁধা। আমার সাম্রাজ্যে থাকবে না উন্মত্ত দামোদরের দু-কূল-ভাঙা প্লাবন, থাকবে না অনাবৃষ্টির সর্বনাশা উত্তাপ। থাকতে দেব না।

শোভা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, কাল সকালেই কি তুমি রওনা হচ্ছ?

হ্যাঁ, প্যান-আমেরিকানে যাচ্ছি। পৃথিবীর বড় বড় রাজধানী ক'টাতে একটা ক'রে অফিস খুললেও ফিরে আসতে এক বছর লাগবে। ডাক্তার-বৈদ্য, পুলিস-পেয়াদা, টাকা-পয়সা সবই তোমার হাতের কাছে রইল।—শশাঙ্ক-বাবু ছোট টেবিলটা আলগা ক'রে তুলে নিয়ে সরিয়ে রাখলেন শোভা দেবীর হাতের কাছে। বললেন, এই কালো টেলিফোনটায় ভারতবর্ষকে পাবে, আর সাদাটায় পাবে পৃথিবী। সাদাটা নিয়ে তুমি কষ্ট ক'রো না, লণ্ডন কিংবা লিসবন থেকে আমি তোমায় ডেকে নেব।

শশাঙ্কবাবু বেরিয়ে যাচ্ছিলেন ঘর থেকে, শোভা দেবী পেছন থেকে বললেন, সুজিত কাল বলছিল—

কি বলছিল? কি বলছিল সুজিত?—শশাঙ্কবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন দু দরজার মাঝখানে।

সুজিত জিজ্ঞাসা করছিল, তুমি এত অল্প সময়ে এত বড় সাম্রাজ্য গড়লে কি ক'রে? জার্মানির কুরুপ-পরিবার পারেন নি, চেম্বারলেন-বীভারব্রুকরা শুরু করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, ডু প'ন্ট কিংবা ফোর্ড-পরিবারের পেছনেও হঠাৎ আবির্ভাবের বিস্ময় নেই—তবে তুমি পারলে কি ক'রে? সুজিত জানে, নফর কুণ্ডু লেন থেকে ছোট রাসেল স্ট্রীটে উঠে আসতে

তোমার এক বছরও লাগে নি। অর্থবিদ্যার মহাকাশে তোমার সাফল্যের উল্কার সন্ধান সুজিত কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না।

শশাঙ্ক গুপ্ত হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মুহূর্ত কয়েক। তারপর বললেন, অর্থবিদ্যার মহাকাশের সবটুকু ও দেখে নি।

তবু যাওয়ার আগে একটা বিশ্বাসযোগ্য জবাব দিয়ে গেলে বোধ হয় ভালই করতে।

পরের দিন প্যান-আমেরিকানের উড়ো-জাহাজ দমদম বিমানঘাঁটি থেকে রওনা হ'ল নির্দিষ্ট সময়ে। শশাঙ্ক গুপ্তও ছিলেন সেই জাহাজে।

দমদম বিমানঘাঁটিতে প্রধান ম্যানেজার দত্ত সাহেব উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন অফিস-কারখানার কর্মচারীবৃন্দ। প্রত্যেকের চাঁদার টাকায় ফুলের মালা কেনা হয়েছে। মস্ত বড় মালা। টাটকা ফুলের গন্ধ শুঁকলেন শশাঙ্ক গুপ্ত, হাসলেন একটু সরলভাবেই। তার পর মালাটা ফিরিয়ে দিলেন ম্যানেজারের হাতে। তিনিও আবার নিজের হাতে রাখলেন না, তুলে দিলেন প্রধান হিসেবরক্ষক বিপুলবাবুর হাতে। বিপুলবাবুও বেশিক্ষণ বইতে পারলেন না দামী ফুলের বোঝা। এদিক ওদিক চেয়ে তিনিও শেষ পর্যন্ত মালাটা ফেলে রাখলেন বিমানঘাঁটির ওয়েটিং-রুমের এক কোণায়।

শশাঙ্ক গুপ্ত উড়ো-জাহাজের দরজায় দাঁড়িয়ে ফেল্টের টুপিটা তুলে ধরলেন তাঁর নিজের কপালের সামনে। প্রীতিমুগ্ধ কর্মচারীবৃন্দ চেয়ে রইলেন দমদমের আকাশের দিকে। একটু পরে জাহাজখানাকে আর দেখা গেল না। বাসের ভিড় ঠেলে তাঁদের সবাইকে বাড়ি ফিরতে হ'ল।

অফিসে যাওয়ার তাড়া নেই আজ। মালিকের শুভযাত্রার দিনে অফিসটা বন্ধ থাকলে কেমন হ'ত? এক দিন না গেলেই বা কি হয়! মানুষের শরীরে কি ব্যাধি-পীড়া নেই? নিজের শরীরে না থাক্, স্ত্রী-পুত্রের শরীরে তো থাকতে পারে? তা ছাড়া জনৈক শশাঙ্ক গুপ্তের মুনাফার খাতা লিখতে

হবে ব'লে তাঁদের সর্দি-কাশিও হতে পারবে না, সেই বা কেমন কথা? কথা যেমনই হোক, অনেকেই আজ অফিসে গেলেন না।

বিপুলবাবু বাড়ি ফিরে সেই যে ঘুম দিয়েছেন, বেলা দুটো পর্যন্ত তাঁর আর সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

দত্ত সাহেব অফিসে ব'সে ছটফট করতে লাগলেন। প্রধান হিসেবরক্ষক হাতের কাছে না থাকলে তিনি দশ-বিশ টাকার আদান-প্রদান করতেও ভয় পান। তিনি ভাবলেন, মালিকের অবর্তমানে প্রথম দিনেই এই অবস্থা? দত্ত সাহেব রাগ করলেন খুব। মনে মনে ঠিক করলেন, অনুপস্থিত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে তিনি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। তিনি টেলিফোনটা তুলে নিলেন বিপুলবাবুকে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দেবেন ব'লে। কিন্তু পরের মুহূর্তেই তাঁর দিব্যজ্ঞান ফিরে এল। বিপুলবাবুকে কড়া কথা বলবার নৈতিক সাহস তাঁর নেই। নেই কেন? ফাঁক-ফন্দী ছাড়া ব্যবসা হয় না, দু সেট খাতা না রাখলে কোম্পানি চলে না,—তবে তিনি বিপুলবাবুকে ধমকাবেন কি ক'রে? বিপুলবাবুর এসব কথা জানা আছে। জানা আছে ব'লেই তিনি দুটো পর্যন্ত ঘুমিয়ে, বেলা আড়াইটার সময় টেলিফোন করলেন দত্ত সাহেবকে, পুরো মাইনেতে সাত দিনের ছুটি নিলুম। ক্যাশের চাবিটা আমার কাছেই আছে। নিয়ে যাওয়ার জন্যে লোক পাঠাবেন দশ-বিশ মিনিটের মধ্যে। তিনটের শো-তে শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত মেট্রোতে যাচ্ছি। ছবি দেখতে নয়, ঘুমোতে। অক্রূর দত্ত লেনে বড্ড গরম। গা থেকে এক বালতি ঘাম বেরিয়েছে।

দত্ত সাহেব লোক পাঠালেন পাঁচ মিনিটের মধ্যেই। দরকার থাকলে কিছু টাকাও তিনি আগাম দিতে পারেন ব'লে বিপুলবাবুকে খবর পাঠালেন।

ছ মাসের মধ্যেই গুপ্ত লিমিটেডের অফিস-কারখানায় মহা গণ্ডগোল আরম্ভ হয়ে গেল। ম্যানেজার দত্ত সাহেব কোন দিকই সামলাতে পারছেন না। এ

কোম্পানির কর্মচারীদের কারও কিছু অভাব ছিল না ব'লেই তিনি জানতেন। অথচ বেশি মাইনে দাবি ক'রে কেরানী-মজুররা একদিনের জন্যে নমুনা-ধর্মঘট পালন করল। টোকেন স্ট্রাইক। দত্ত সাহেব বিচলিত হয়ে পড়লেন।

ছোট রাসেল স্ট্রীটে খবর গেল। শোভা দেবী কি করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। গতকল্য স্বামী তাঁর খানা খেয়েছেন খুনী জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে মাদ্রিদে। আজ কোথায় খানা খাচ্ছেন, তিনি কি ক'রে জানবেন ?

বাতাসের গতির চেয়েও স্বামীর গতি দ্রুততর। শোভা দেবী বালিশের তলা থেকে একটা লম্বা কাগজ টেনে বার করলেন। শশাঙ্কবাবুর 'টুর প্রোগ্রাম'। তারিখ মিলিয়ে দেখলেন তিনি, স্বামী তাঁর পীরেনিজ পাহাড় পার হচ্ছেন। কেমন ক'রে ধরবেন তাঁকে ? আকাশের কোন্ অঞ্চলে কখন তাঁর চলাফেরা, শোভা দেবী তার হদিস পেলেন না শশাঙ্কবাবুর টুর প্রোগ্রামে।

রাত দুটোর সময় টেলিফোন এল। সাদা টেলিফোনটা তাড়াতাড়ি কানের কাছে তুলে নিলেন তিনি। বললেন, হ্যালো ? কে ?

আমি।—জবাব দিলেন শশাঙ্কবাবু।

তুমি এখন কোথায় ?

নেপ্ল্সে।

সেখানে কি করছ ?

একটু আগে বন্দরে ঢুকেছিলুম।

কেন ?

প্রধানমন্ত্রী গ্যাসপেরীকে সঙ্গে নিয়ে একটা জাহাজ দেখলুম।

তুমি আদার ব্যাপারী জাহাজ দিয়ে কি করবে ?

আদা এবং জাহাজ দুটোই কিনব। আর এটা তো যুদ্ধজাহাজ।

যুদ্ধজাহাজ! চারিদিকে সবাই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, আর এই সময় গ্যাসপেরী সাহেব জাহাজ বেচতে চান কেন ?

না বেচলে ইতালি ডুববে। তৃতীয় মহাযুদ্ধের অনেক আগেই ডুববে। আমরা কজন কেবল একটু বডি-ওয়েট দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছিলাম, অমনি জল উঠতে লাগল।

তবে সেটাকে জোড়াতালি দিয়ে ভারতবর্ষের বন্দরে টেনে আনছ কেন ?

বন্দর ? ছোট রাসেল স্ট্রীটের দোতলার ঘরে শুয়ে তুমি বন্দর দেখতে পাচ্ছ নাকি শোভা ?

বন্দর না দেখলে কি হবে, তোমাকে তো দেখতে পাচ্ছি। জাহাজটাকে বন্দরে টেনে আনবার সময় একবার দালালি পাবে, আবার সেটাকে যেদিন ডাঙায় তুলে দেবে সেদিন পাবে দ্বিতীয়বার।

গ্যাসপেরী অপেক্ষা করছেন, আমি চললুম। এবার দামদস্তুর ঠিক হবে। হ্যালো! কাল যাচ্ছি ভ্যাটিকানে। ধর্মগুরু পোপ পৃথিবীর শান্তি কামনা ক'রে বক্তৃতা দেবেন। ওখান থেকে ফিরে এসে যুদ্ধজাহাজটা ডেলিভারি নেওয়ার বন্দোবস্ত করব। এবার যাই ?

কোথায় যাবে ?

বিক্রেতা দাঁড়িয়ে আছেন। এদিক থেকেও কিছু কমিশন পাওয়া যাবে।

ভ্যাটিকান থেকে ঘুরে এসে সোজা চ'লে আসবে কলকাতায়। জাহাজ কেনার দরকার নেই। ভারতবর্ষ ডুবে গেলে তুমি দাঁড়াবে কোথায় ? তা ছাড়া তোমার অফিস-কারখানায় কাজকর্ম কিছুই হচ্ছে না, কেবল মীটিং হচ্ছে।

কেন ? কেন ? ওদের অভাব তো আমি কিছুই রেখে আসি নি ? এমন কি ষাট টাকার বাবুর্চীও পাঁচ বছর পরে দেড় শো টাকা পাবে।

ওরা বোধ হয় পাঁচ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইছে না। শুরুতেই দেড় শো চায়।

আমি আসছি। হ্যালো! হ্যাঁ, আসছি। ভ্যাটিকানের প্রোগ্রাম বাতিল ক'রে দিলুম।—শশাঙ্কবাবু টেলিফোন ছেড়ে দিলেন।

এক সপ্তাহ পরে তিনি ফিরে এলেন। প্যান-আমেরিকান কোম্পানির ব্যাগটা দমদম থেকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন ছোট রাসেল স্ট্রীটে, নিজে চ'লে গেলেন সোজা অফিসে।

অফিসে ঢুকেই তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। প্রায় পঞ্চাশ ভাগ কর্মচারী অফিসে নেই। পঁচিশ ভাগ পাখার তলায় দিবানিদ্রা দিচ্ছে। অবশিষ্ট পঁচিশ ভাগের মধ্যে পনরো ভাগ বিড়ি সিগারেট ফুঁকছে। বাকি দশ ভাগ কেবল কলম নাড়াচাড়া করছে।

খবর পেয়ে দত্ত সাহেব ছুটে এলেন। দাঁড়ালেন এসে শশাঙ্ক গুপ্তর সামনে।

ব্যাপার কি মিস্টার দত্ত?

অরাজকতা। আপনি যাওয়ার পর কোম্পানির এক পয়সাও লাভ হয় নি, সবটাই লোকসান।

কিন্তু লোকসানের হিসেব রাখবার জন্যেও তো লোক চাই মিস্টার দত্ত? অফিস যে ফাঁকা দেখছি! ওরা কি চায়?

বেশি মাইনে।

বেশি মাইনে কি আমি দিই না?

তার চেয়েও বেশি।

তা হ'লে বিপুলবাবুকে ডাকুন, হিসেব দেখব।

তিনি নেই। কর্মচারীরা ওঁকে বন্দী ক'রে রেখেছে। পুলিসও তাঁকে খুঁজে পাচ্ছে না।

বিপুলবাবুর কাছে কি পাবে ওরা মিস্টার দত্ত?

লুকনো মুনাফার মোট অঙ্ক।

শশাঙ্কবাবু চুপ ক'রে রইলেন কতক্ষণ। তারপর বললেন, আমার একটা লুকনো খাতা আছে তাই বা ওরা জানল কি ক'রে মিস্টার দত্ত?

সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে।

কি রকম?—শশাঙ্কবাবুর কৌতূহল বাড়ল।

দত্ত সাহেব জবাব দিলেন, আপনার ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যের পরিমাণের সঙ্গে কোম্পানির ব্যালান্স শীটের একেবারে মিল নেই। বিপুলবাবুর হিসেবমত আপনার যদি প্রতি বছরই শতকরা সাড়ে তিন টাকা ক'রে লাভ হয়, তা হ'লে কেবল কলকাতা শহরেই আপনি এক শো পাঁচখানা বাড়ি কিনলেন কি ক'রে? তা ছাড়া, আপনার আন্তর্জাতিক লগ্নির গোপন খবরও ওরা জানে।

এসব তো ইকনমিক্সের কথা নয় মিস্টার দত্ত, বিপ্লবের কথা।

তা হ'লে বোধ হয় বিপ্লব এসেই গেছে।

শশাঙ্ক গুপ্ত উদ্বিগ্নভাবে টেবিলের ওপর থেকে একটা ফাইল তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

মিস্টার দত্ত, এই বিপ্লবের সর্দার কে বলতে পারেন?

পারি।

পুলিসের কাছে নাম দিয়েছেন?

না।

কেন?

পুলিস সর্দারকে ধরতে চায় না।

তা হ'লে টেলিফোনটা একবার দিন, দিল্লীতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে একবার কথা কইব। আমি একবার জিজ্ঞাসা করি তাঁকে, পুলিস কি চায়!

পুলিসও আপনার লুকনো খাতা চায় সার্।

শশাঙ্ক গুপ্ত টেলিফোনের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। গড্রেজ কোম্পানির সিন্দুকের দিকে চেয়ে বললেন, বিপ্লব যদি এসে গিয়েই থাকে, তা হ'লে আপনি কি করবেন মিস্টার দত্ত?

ওরা যখন সামনের দরজা দিয়ে ঢুকবে, আমি তখন পেছনের জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ব ক্লাইভ স্ট্রীটের ওপর।—ওই, ওরা বোধ হয় আসছে।

এই সময় অফিসের সামনে কেরানী-মজুরদের শোভাযাত্রা এসে পৌঁছে গেল। দত্ত সাহেব ছটফট করতে লাগলেন, কি করবেন কিছুই ভেবে উঠতে পারলেন না।

শশাঙ্ক গুপ্ত বললেন, ওদের সর্দারকে ডেকে নিয়ে আসুন। যাওয়ার আগে একবার সাক্ষাৎ ক'রে যেতে চাই।

দত্ত সাহেব বেঁচে গেলেন, বৈপ্লবিক অর্থনীতি নিয়ে তাঁকে আর সর্দারের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতে হবে না। তিনি ছুটলেন লিফ্‌টের দিকে।

একটু পরে ঘরে ঢুকল সুজিত।

শশাঙ্কবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, জামা-কাপড় এত নোংরা কেন রে? দাড়ি কামাস নি কেন?

সময় পাই নি।

পয়সা রোজগার করি আমি, তোর সময়ের এত অভাব কেন?

সুজিত কোনও জবাব দিল না। পকেট থেকে একটা লম্বা ফর্দ বার ক'রে তাতে চোখ বুলোতে লাগল।

শশাঙ্কবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফর্দ না কি রে?

না। তোমার লুকনো হিসেব। বিপুলবাবু দিয়েছেন।

ও, তাই নাকি?—শশাঙ্কবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। যাওয়ার জন্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

সুজিত বললে, এতে কেবল ভারতবর্ষের কালো-বাজার দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু অন্যান্য মহাদেশের হিসেব নেই।

দেব, নিশ্চয়ই দেব। কাল অফিস-টাইমে একবার লোক পাঠিয়ে দিস।

আমি নিজেই আসব।

সন্ধ্যের দিকে তিনি ছোট রাসেল স্ট্রীটে এলেন।

রাত আটটায় প্যান-আমেরিকান কোম্পানির একটা ডাকোটা সিঙ্গাপুর যাবে। তিনি টিকিট কেটেছেন তাতে।

বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে তিনি বাগানের মধ্যে ঢুকলেন। উড়িয়া

মালী তাঁকে দেখতে পেল না। কিন্তু তিনি দেখলেন, মালীটা এক ঝুড়ি ফুল বিক্রি করছে অপর এক মালীর কাছে। হয়তো অপর মালীর বাগানে আজ বিক্রি করবার মত ফুল ফোটে নি। শশাঙ্ক গুপ্ত বললেন না কিছুই। দারোয়ানটার ফটকে ব'সে পাহারা দেবার কথা। তিনি হাঁটতে হাঁটতে গেলেন দারোয়ানের ঘরের দিকে। জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন তিনি। দেখলেন, দারোয়ান আর বয়-বাবুর্চীরা সব চা-পান করছে। তিনি গন্ধ পেলেন, দামী চায়ের গন্ধ। কেবল তাই নয়, আম্‌স্টারডাম থেকে যে তিনি মাখনের ক'টা টিন পাঠিয়েছিলেন, তা থেকে একটা টিন ওরা খুলে নিয়েছে। থাবা দিয়ে মাখন নিয়ে নিয়ে ফার্‌পো কোম্পানির রুটির ওপর লেপ্টে লেপ্টে মাখন লাগাচ্ছে কাঠমাণ্ডুর দর্পনারায়ণ সিং। অন্ধ্র দেশের তেলেগু আয়া সঙ্গ দিচ্ছে ওদের।

শশাঙ্ক গুপ্ত সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে যাচ্ছিলেন। একতলার বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল রমা। বাবাকে দেখতে পেয়েই সে নীচু হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিল। উঁচু হয়ে দাঁড়াবার পর তিনি দেখলেন, রমার সিঁথিতে সিঁদুর।

রমা বললে, এইমাত্র আমরা বিয়ে ক'রে ফিরলুম বাবা।

এই মাত্র ?—এ ছাড়া শশাঙ্কবাবু আর কি-ই বা জিজ্ঞাসা করতে পারতেন !

হ্যাঁ বাবা, তোমাদের কাউকেই আগে জানাতে পারি নি। তা ছাড়া, তুমি বোধ হয় ক'দিন থেকে অফিসেই ছিলে, তোমাকে দেখতে পাই নি।

বাধা দিয়ে শশাঙ্কবাবু বললেন, অফিসে নয়, ইউরোপে, ছিলাম।

ইউরোপ ? ও, হ্যাঁ, ইউরোপ। সেই জন্যেই বোধ হয় তোমাকে জানাতে পারি নি।

ভালই করেছ। নো রিস্‌ক্, নো গেন। কিন্তু কার সঙ্গে বিয়ে হ'ল ?

ওই যে তুমি যাকে লোফার বলতে, সেই বটুক মাইতি। কেবল তুমি বলবে কেন, তোমাদের পুরনো সভ্যতার সংজ্ঞানুসারে বটুক মাইতিরা চিরদিন লোফারই ছিল। কিন্তু এখন থেকে সে তোমার জামাই।

জামাই হ'লেও সে লোফার।

লোফার হ'লেও সে কালো-বাজারে লোফ্ করে না বাবা।

তবে সে করে কি?—প্রশ্ন করলেন শশাঙ্কবাবু।

ভুখা-মিছিলের সামনে সে ঝাণ্ডা বহন করে। বটুকের গুণের অভাব নেই। ব্যবসা-বাণিজ্যের নাম ক'রে সে জুয়াচুরি করে না; পান-তামাকের প্রতি ওর কোন আকর্ষণ নেই। মদ-আফিমের গন্ধ শুঁকলে ওর বমি আসে। সমাজ ও প্রতিবেশীকে ঠকাবার জন্যে স্বার্থপর সভ্য মানুষদের মত বটুক দরজা বন্ধ ক'রে কালো-টাকার হিসেব করে না। পরের দুঃখে ওর বুক ফেটে যায়, চোখ দিয়ে জল আসে। বাবা, তোমার তো কোটি কোটি টাকা আসে, কিন্তু চোখ দিয়ে জল আসে কই? বটুক ভালবাসতে জানে, ওর ভালবাসার জাহাজ একদিন পৃথিবীর সব ক'টি বন্দরে নোঙর ফেলবে। বাবা, তোমার জাহাজ তো ফুটো।

বটুককে ডাক্ না, একবার দেখি।

সে দাড়ি কামাচ্ছে। এক বছর পর এই তার প্রথম দাড়ি কামানো। মাকে খবরটা তুমিই দিও বাবা।

তোমরা স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে এসে মার সামনে দাঁড়াও।

তা হ'লে একটু দেরি হবে বাবা। তিন বছর পর বটুক এই প্রথম চান করবে।

শশাঙ্কবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, হাঁপানীর চেয়েও যে বড় কষ্ট আছে, সেটা তিনি যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবেন ততই মঙ্গল।

শশাঙ্ক গুপ্ত শোভা দেবীর ঘরে সহসা ঢুকতে পারলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাইরে থেকেই হাঁপানীর আক্রমণ দেখতে লাগলেন। শোভা দেবীর কষ্ট আজ সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। মুহূর্তে মুহূর্তে খেঁচুনি উঠছে। এক গণ্ডূষ বাতাস টানবার তাঁর আকস্মিক উদ্যম শিথিল হয়ে আসছে অবলীলাক্রমে। বালিশটা আঁকড়ে ধরলেন শোভা দেবী। চিৎকার ক'রে ডাকবার চেষ্টা

করলেন, আয়া—আয়া! তারপর তিনি সহসা সাদা টেলিফোনটা ধরতে গেলেন। কিন্তু তিনি তো স্বামীর ঠিকানা জানেন না!

শশাঙ্কবাবু এক বিচিত্র জগতের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। শারীরিক যন্ত্রণার এমন নগ্ন বিকৃতি তিনি এই প্রথম দেখলেন। কোটি টাকার রস নিংড়ে শোভা দেবীকে খাইয়ে দিলে কি কষ্টের উপশম হবে? হবে না। তবে কেন বেঁচে আছেন তিনি? শশাঙ্কবাবু পকেটে হাত দিলেন। বার করলেন একটা ছোট্ট কাগজের প্যাকেট। ঘরে ঢুকে বললেন, ওষুধটা চট ক'রে খেয়ে নাও। জলের গেলাসটা তিনি তুলে ধরলেন স্ত্রীর মুখের কাছে। মুহূর্তের মধ্যে শোভা দেবী এলিয়ে পড়লেন বিছানায়। কোন প্রশ্ন করবারই সুযোগ পেলেন না তিনি।

শশাঙ্কবাবু চেয়ে রইলেন শোভা দেবীর চোখের দিকে। তাঁর যেন মনে হ'ল, তিনি অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন, একেবারে নফর কুণ্ডু লেনের শেষ অবধি।

শশাঙ্কবাবু নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনতলায় ওঠবার প্রয়োজন বোধ করলেন না তিনি। চাইলেন না ডাইনে বাঁয়ে, নেমে এলেন একতলায়। প্যান-আমেরিকান কোম্পানির ব্যাগটা তুলে নিলেন হাতে। কেউ তাঁকে দেখতে পেল না, তিনিও কাউকে দেখবার চেষ্টা করলেন না। থিয়েটার রোড পর্যন্ত হেঁটে এসে তিনি ঘড়ি দেখলেন, সাতটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। পৃথিবীর সব ক'টি রাজধানী তাঁর চেনা। কলকাতাকে ভুলে যেতে তাঁর পাঁচ ঘণ্টাও লাগবে না। দমদম যাওয়ার পথে ট্যাক্সিতে ব'সেই তিনি সিঙ্গাপুরের রাস্তাঘাটের কথা ভাবতে লাগলেন। আগামী কল্য সন্ধ্যের সময় তিনি সিঙ্গাপুর থেকে রওনা হয়ে যাবেন চ'লে ম্যানিলার দিকে। সেখানেও তিনি থাকবেন মাত্র এক সপ্তাহ। তার পর?

ট্যাক্সি এল বিমানঘাঁটির দরজায়। মিটারে যা ভাড়া উঠল তার ডবল টাকা ড্রাইভারের হাতে গুঁজে দিয়ে শশাঙ্কবাবু ছুটলেন টেলিগ্রাম করতে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাজধানীতে খবর দিলেন: আমি আসছি।

তিনি চ'লে গেলেন ভারতবর্ষ ছেড়ে। কিসের অভাব তাঁর? প্যান-আমেরিকান কোম্পানির ব্যাগটা খুলে দেখলেন তিনি, বড় বড় ব্যাঙ্কের চেক বইগুলো প'ড়ে রয়েছে তাতে। দুনিয়ার কোন রাজধানীতেই তাঁর অভাব কিছু নেই; সাম্রাজ্য তাঁর কেবল ভারতবর্ষেই নয়। টাকা থাকলে বিষুবরেখার এদিক ওদিক দুদিক জুড়েই তিনি সাম্রাজ্য তাঁর বিস্তার করবেন।

বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে উড়ো-জাহাজ। অন্যান্য যাত্রীরা সব ঘুমিয়ে পড়েছেন। শশাঙ্কবাবু ব'সে ব'সে অনেক কথা ভাবছেন। ভারতবর্ষে তাঁর একটা সাম্রাজ্য প'ড়ে রইল। প'ড়ে রইল জীবনের পঞ্চাশটা বছর। তিনিই কেবল ইতিহাস থেকে যেন আলগা হয়ে গেলেন। হয়তো বাকি জীবনটা তাঁর আলগা হয়েই থাকতে হবে। কিন্তু মাটি থেকে আলগা হয়ে কোন্ গাছটা বাঁচে? তিনিই বা বাঁচবেন কি ক'রে? তবে কি তিনি ভুল করলেন? তিনি ভাবলেন, বিনা যুদ্ধে সাম্রাজ্যটা বোধ হয় ছেড়ে আসা উচিত হ'ল না। কিন্তু যুদ্ধ করবেন তিনি কি দিয়ে? অস্ত্র কই? অস্ত্র মানে—নৈতিক অস্ত্র কি তাঁর ছিল?

জানলা দিয়ে নীচের দিকে চাইলেন তিনি। বঙ্গোপসাগর গর্জন করছে, পাহাড়ের মত উঁচু ঢেউগুলো সব লাফিয়ে লাফিয়ে ওপর দিকে উঠে আবার ভেঙে পড়ছে কুচিকুচি কাচের মত।

শশাঙ্ক গুপ্ত অনুভব করলেন, তিনিও যেন আজ ভেঙে পড়ছেন, ভেসে যাচ্ছেন লক্ষ যোজন দূরে। ভাঙা ওই ঢেউগুলোর মত সাম্রাজ্য তাঁর সঙ্গে গেল। ডুবল সব। ডুববেই। তাঁর ফুটো সাম্রাজ্য কালো-টাকার মহাসমুদ্রে ডুবে গেল, আর উঠল না।

উঠলেও, আবার ডুববে। ডোবে না কেবল 'নোয়া'র নৌকো।

'জনসেবক'
শারদীয় সংখ্যা ১৩৬০

একটি পুরনো আলিঙ্গন

আমি এইমাত্র সুইট্‌জারল্যাণ্ড থেকে ফিরলুম।

বড় সুন্দর দেশ। ধুলো, বালি আর কালির সঙ্গে পরিচয় হয় না সমস্তটা জীবন পথে প'ড়ে থাকলেও।

আমার জীবনের চল্লিশটা দিন সুইট্‌জারল্যাণ্ডের রাস্তায় প'ড়ে ছিল, আরও চল্লিশটা বছর প'ড়ে থাকলেও আমার কোনও আক্ষেপ থাকত না। আক্ষেপ মানে—স্বদেশের সঙ্গে সম্পর্ক না-রাখার আক্ষেপ। আজকাল উড়ো-জাহাজে ডাক-বিলির সুবন্দোবস্ত থাকায়, চিঠিপত্রের দ্রুত যোগাযোগে স্বদেশের ছবি কিছুতেই ভুলে যাওয়া যায় না।

আমি ভুলতে চেয়েছিলুম। পারি নি। ভারতবর্ষ থেকে একখানা চিঠি এসেছে, চারদিন হ'ল টেবিলের ওপর প'ড়ে আছে, খুলি নি। আমি ভুলে যেতে চেয়েছিলুম ভারতবর্ষকে। ধুলো, বালি আর কালির ভারতবর্ষ আমার সুস্থ জীবনকে অসুস্থ ক'রে তুলেছে। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে আমি এসেছিলুম হাওয়া-পরিবর্তনের জন্যে—সাদা শিফন শাড়ির মত পরিষ্কার হাওয়া।

ভারতবর্ষের চিঠিখানা টেবিলেই প'ড়ে আছে। প্রথম দিন অতিকষ্টে টেবিলের দিকে পেছন দিয়ে ঘরের মধ্যে চলাফেরা করলুম। টেবিলটা ছিল পূব দিকে। অতএব পশ্চিমের দিকে মুখ ক'রে দেহটাকে কাত ক'রে দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে হ'ত। উত্তর গোলার্ধের দূরত্ব ধ'রে রাখবার জন্যে কম্বলটাকে টেনে তুলে দিতুম মাথার চুল অবধি। সারারাত শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হ'ত, ভাল ক'রে ঘুমোতে পারতুম না। পারতুম না বটে, কিন্তু বিষুবরেখার উত্তরে অবস্থিত ভারতবর্ষের কথা মনে পড়লে কম্বল-আচ্ছাদিত সংক্ষিপ্ত আয়তনটুকুর মধ্যে কম্পন উঠত, মনে হ'ত পুরো দক্ষিণ গোলার্ধটি এক মুঠো ধুলোর মত হয়ে আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করছে।

চারদিন পর কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে পূব দিকে মুখ ক'রে 'নিরাপদ-ক্ষুর' দিয়ে দাড়ি কামাতে কামাতে হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়ল টেবিলের ওপর। ভারতবর্ষের চিঠিখানা প'ড়ে রয়েছে। খামের ওপর টিকিট লাগানো আছে, টিকিটের ওপর আঁকা অশোক-স্তম্ভ। আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলুম, নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন সিংহ তিনটিকে আক্রমণ করবার জন্যে এগিয়ে গেলুম টেবিলের দিকে। মনে হ'ল, আমি পশুর চেয়েও বেশি হিংস্র। আমার ভয়ে পশুগুলো যেন মাটি কামড়ে প'ড়ে আছে গিরি-গহ্বরে। আমি গিরি-গহ্বর থেকে সিংহ তিনটি টেনে বার করবার জন্যে খামটি হাতে তুলে নিলুম। মনে আমার আগুন জ্বলতে লাগল। "আমরা বাঙালী বাস করি এই—" কবিতার কলিগুলো সুইট্জারল্যাণ্ডের ঠাণ্ডায় আগুনের হলকার মত আমার চামড়ায় তাপ দিতে লাগল। "—বাঘের সঙ্গে লড়াই করেছি—," আর খামের সঙ্গে পারব না? চেষ্টা করতে লাগলুম। খামখানা হাতে নিয়ে অগ্নি-চুল্লির দিকে এগিয়ে গেলুম। আমার এক হাতে নিরাপদ-ক্ষুর, অন্য হাতে তিনটি সিংহ—অশোক-স্তম্ভ। কেবল স্তম্ভ নয়, ভারতবর্ষের সরকারী পরিচয়। কেবল সাধারণ পরিচয় নয়, একটা গোটা জাতির ঐতিহ্য-স্তম্ভ। এই স্তম্ভের মধ্য দিয়ে কেবল সম্রাট অশোকের কীর্তিই দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে তাঁরও পশ্চাতের ভারতবর্ষকে ইতিহাসের অবিচ্ছিন্নতায়। আমি দেখলুম, ভারত সরকারের অশোক-স্তম্ভটাও সেই অবিচ্ছিন্নতারই অংশ। অংশ ভারতবর্ষের শ্যামলী।

সহসা টুপ ক'রে খামের ওপর এক ফোঁটা রক্ত পড়ল। ক্ষুর টানতে গিয়ে কোন্ সময় গালের চামড়া কেটে গেছে—টের পাই নি। টের পাওয়ার কথাও নয়। ইতিহাস যখন কাটতে শুরু করে, কেউ তখন টের পায় না। সুইট্জারল্যাণ্ডে আমি এসেছিলুম হাওয়া-পরিবর্তন করতে। ভারতবর্ষের শ্যামলীকে আমি ভুলে যেতে চেয়েছিলুম। কিন্তু পারলুম না। শ্যামলীর ইতিহাস-অস্ত্র আমায় কাটছে। পাঁচ বছরের পরিচয় পাঁচ লক্ষ বছরের ব্যবধানেও বোধ হয় ভুলে যাওয়া যাবে না। খামখানা খুললুম।

শ্যামলী লিখেছে : শম্ভুদা, আজ আমার জন্মদিন—

কাচের জানলার ওপর পর্দা ঝুলছিল। পর্দাটা এক দিকে সরিয়ে দিয়ে জানলাটা খুলে দিলুম। বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। দেখা যায় জুরা পাহাড়ের বুকে বরফ জমেছে। কিন্তু ইতিহাসের বুকে কোনদিনও বরফ জমে না। সময়-স্রোত চিরদিনই তরল। জানলার মধ্য দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি, অসংখ্য শ্যামলীর অসংখ্য জন্ম সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়েছে। কোন একটি বিশেষ জন্মদিনের চেয়ে শ্যামলীর সংখ্যাতীত জন্মের সমষ্টিগত বিস্ময়টা যেন আজ আমায় টানতে লাগল ভারতবর্ষের দিকে। কলকাতার তারা রোডের শ্যামলী আমার জীবনে অ্যাক্সিডেণ্ট—কিন্তু শ্যামলীর জন্ম অ্যাক্সিডেণ্টাল নয়। একটা সিগারেট ধরিয়ে পুনরায় পড়তে লাগলুম শ্যামলীর চিঠি।—

শম্ভুদা, জন্মদিনে আজ কেবল তোমার কথাই স্মরণ করছি। কেবল তোমার কথাই। তুমি যেদিন ভারতবর্ষের মাটি থেকে আলগা হয়ে গেলে, আমিও সেদিন আলগা হয়ে গেলুম আমার ভাগ্য-বিধাতার সম্পর্ক থেকে। তোমার মত একজন আধুনিক নিষ্ঠুর ও নৃশংস পুরুষকে পাওয়ার জন্যে আমার তপস্যা আর লোকোত্তরিত নির্ভরতায় অপচয়িত হবে না। একটা অন্ধকার বৃত্তের মধ্যে তোমাকে বড় সুন্দর দেখায়। আমার যক্ষ্মা-যন্ত্রণার চক্রাকার জগতে তুমিই একমাত্র পুরুষ, যার ভালবাসার শলাকা উর্ধ্বদিকে বর্ধিত হয় না, বৃত্তের মধ্যে কেবল ঘুরে ঘুরে মরে—

এই পর্যন্ত প'ড়ে চিঠিখানা বন্ধ ক'রে রাখলুম। এক নিশ্বাসে পড়বার মত চিঠি এ নয়। ভারত-সরকারের অশোক-স্তম্ভটা যেন সমগ্র সুইট্জারল্যাণ্ডকে গুঁতো মারতে লাগল। ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি? এমন সুন্দর সাজানো-গোছানো ষোল হাজার বর্গ মাইলের দেশটিতে এসেছিলুম হাওয়া বদলাতে, ভুলতে চেয়েছিলুম ভারতবর্ষকে।

পশ্চাতের শ্যামলী আমার সামনে এসে দাঁড়াল। বুকে যক্ষ্মা, ঠোঁটের কিনারে মেটে সিঁদুরের মত রক্তের ছিটে-ফোঁটা লেগে রয়েছে। উচিত ছিল

ওরই হাওয়া বদলাতে আসা। কিন্তু শ্যামলীর ভাগ্যবিধাতা শ্যামলীর হাতে টাকাপয়সা দেন নি। আমিই দিয়েছি ওকে দু-দশটা উপহার। সে দেওয়ার মধ্যে খরচের উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না, ছিল শ্যামলীর কাছ থেকে পাওয়া প্রেমের হিসেব-করা মূল্য। বিনিময়-অর্থনীতি আমার জীবনের একমাত্র সুস্থ নীতি। কিন্তু শ্যামলীর কাছে সেই উপহারগুলোর কতই বা মূল্য! বেচতে গেলে হয়তো খদ্দেরই পাবে না। অতএব শ্যামলী সুইট্‌জারল্যাণ্ডে আসতে পারল না। আমার অনেক টাকা, ওকে দিতে পারতুম কিছু। কিন্তু আমার খরচের মধ্যে অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক বাঁধন অত্যন্ত টাইট। ইচ্ছে করলেই আমি দিতে পারি না। জড়বাদের ব্যালান্স-সীটে কড়াক্রান্তির ভাবপ্রবণতা নেই, নেই কানাকড়ির ভুলচুক। সুতরাং ভুল আমার নয়, ভুল অর্থবিদ্যার।

ওকে আমি হয়তো বিয়েও করতে পারতুম। যক্ষ্মার আক্রমণ আমায় রুখতে পারত না। গত পাঁচ বছর ধ'রে ওকে বোধ হয় আমি বিয়ে করব ব'লে আশাও দিয়েছিলুম। কিন্তু মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞান আমার বিয়ের রাস্তা বন্ধ ক'রে দিয়ে হাতে তুলে দিল একটি আশার আঙুর। সেই আঙুরটি আমি গত পাঁচ বছর ধ'রে শ্যামলীর মুখের সামনে ঝুলিয়ে রেখেছিলুম। নইলে শ্যামলীর যতটুকু আমি পেয়েছিলুম, ততটুকুও পেতুম না। আর পুরুষমানুষ যদি ততটুকুও না পায়, তবে তার পুরুষ হয়ে জন্মানোর দরকারই হ'ত না। অতএব শ্যামলীকে বিয়ে না করার দোষ আমার নয়, মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের। মেয়েমানুষের মুখের সামনে বিয়ের আঙুরটি ঝুলিয়ে না রাখলে ওরা ভালবাসতে পারে না। তবে কেন শ্যামলী লিখেছে—আমি নিষ্ঠুর, আমি নৃশংস?

সিগারেটের গোড়ার দিকটা কখন যে চিবিয়ে ফেলেছি, খেয়াল করি নি। একটা প্যারাগ্রাফ পড়তেই কণ্ঠনলীর প্রাচীর ভিজে উঠেছে পচা তিক্ততায়। মনের প্রাচীরও বোধ হয় স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠল।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডের বিশুদ্ধ হাওয়ায় আমি বোধ হয় আর পরিশুদ্ধ হতে পারলুম না। অশোক-স্তম্ভ-আঁকা টিকিটের স্বাক্ষর নিয়ে উপস্থিত হয়েছে

পশ্চাতের এক ক্ষীণাঙ্গী বাস্তব, যক্ষ্মা-বীজাণুর চেয়েও সে বাস্তব বড়। আমার জীবনের ইতিহাস থেকে তাকে আর কেটে বাদ দেওয়া যাবে না। যক্ষ্মা-বীজাণুর কোষস্থিত কষের মধ্যে খুঁজলে আমায় পাওয়া যাবে—পাওয়া যাবে শ্যামলী-জীবনের ভ্রষ্ট-লগ্ন। দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে শ্যামলী লিখেছে: তারা রোড়ের বাড়িতে দিন-দিনই অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। তিনতলার ছাদে সেই ছোট ঘরটায় আমি আছি, মানব-সমাজ থেকে একেবারে পরিত্যক্ত হয়ে। জানলা দিয়ে কলকাতার আকাশ দেখা যায়। আমি দিনরাত চেয়ে থাকি আকাশের দিকেই। আমার দৃষ্টির প্রসারতা বাড়তে থাকে আকাশের গায়ে ভর দিয়ে। বিষুবরেখা পার হতে এক মিনিটও লাগে না। আমি খুঁজতে থাকি সেই মিলনরেখাটি, যেখানে কলকাতার আকাশ গিয়ে মিশেছে সুইট্জারল্যাণ্ডের আকাশের সঙ্গে। তারই নীচে হয়তো তোমার হোটেল। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে কামরায় তুমি পায়চারি করছ, হিসেব করছ—কত ধানে কত চাল হয়। কিন্তু তুমি কি জান শম্ভুদা যে, সবচেয়ে বড় অঙ্কের চূড়ায় ধানচাল নেই, আছে অঙ্কের দর্শন? জীবনের বিস্তৃতি সেখানে বিরাট। সেখানে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাওয়ার পথ খুঁজছে মানুষ। বিজ্ঞানের আলোয় সে পথ সত্যিই সমুদ্ভাসিত। শম্ভুদা, তোমার কি মনে পড়ে কবির সেই লাইনগুলো?—

...At the still point, there the dance is,
But neither arrest nor movement. And do not call it fixity,
Where past and future are gathered...Except for the point, the still point,
There would be no dance, and there is only the dance.

এবার তোমায় দু-একটা সাংসারিক খবর দিচ্ছি। টাকার অভাবে বড় ডাক্তার ডাকা সম্ভব হয় নি। ছোট একজন ডাক্তার আমায় দেখছেন। মনে হয়, তাঁর চিকিৎসার সবটুকুই বিজ্ঞান নয়। তিনি আভাসে-ইঙ্গিতে আমায়

বুঝিয়েছেন যে, তুমি আমার কাছে না এলে এ অসুখ সারবে না। তিনি অবশ্য তোমার নাম জানেন না। আমায় বিয়ে করবে শম্ভুদা? তুমিও একা—তোমায় আমি সঙ্গ দেব। তুমি ফিরে এস।

এর পর চিঠিখানা হাতে রাখবার কিংবা বালিশের তলায় রাখবার প্রয়োজন বোধ করলুম না। অগ্নি-চুল্লিতে নিক্ষেপ করলুম শ্যামলীর চিঠি। যক্ষ্মা-বীজাণু পত্র-বাহিত হয়ে হয়তো আমাকেও আক্রমণ করতে চায়।

শ্যামলী লিখছে, আমি একা। একা কেন? আমার সঙ্গে তো গোটা পৃথিবীটাই আছে? আর আছে কত কাছে! হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারি লণ্ডন, একটু ঝুঁকে বসলেই প্যারিস, দু কদম এগিয়ে যেতে পারলে নিউ ইয়র্ক। ঘরের দরজায় ওলন্দাজ এবং অন্যান্য সব কতকগুলো কোম্পানির অফিস রয়েছে। উড়ো-জাহাজের টিকিট বেচবার জন্যে ওরা দিবারাত্র হাতের মুঠোয় টিকিট নিয়ে ব'সে আছে। তা ছাড়া, আধুনিক মানুষের একাকীত্ব শ্যামলী ঘোচাতে পারবে না ওর মধ্যযুগীয় ভালবাসার বীজাণু-অস্ত্র দিয়ে। জীবনের কোন অংশই নিঃসঙ্গ নয়, বিজ্ঞান-বাহুর আলিঙ্গনে বাঁধা পড়েছে মানুষ। সেখানে বিরহ-বাতাস বইবার অবকাশ নেই। নেই জড়বাদের ভূখণ্ডে ফুটো ফুসফুসের বিবাহ-নাটক অভিনীত হওয়ার রঙ্গমঞ্চ।

দি ড্যান্স? নৃত্য? দেখেছি। গ্রীক দেশ থেকে দক্ষিণ-ভারত পর্যন্ত সব রকমের নৃত্য আমি দেখেছি। কিন্তু সেখানে তো ফুটো ফুসফুসের নৃত্য নেই। শ্যামলীর কবি শ্যামলীকে ভুল বুঝিয়েছেন। ভুল বুঝিয়েছেন কলকাতার এক ছোট ডাক্তার।

•

আজ আমি জেনেভা-হ্রদে নৌকো ভাসিয়েছি। পাশে ব'সে আছে যুবতী মারীয়া। সেও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, আমার সঙ্গে সে সারা জীবন ভাসবে। এ দৃশ্য শ্যামলী দেখতে পেল না! ফোটো তুলে পাঠিয়ে দেব তারা রোডের তিনতলার ছাদে। ফুসফুসের যন্ত্রণা ওর বাড়বে। যন্ত্রণার মৃত্যুকালো

গুহাভ্যন্তরে শ্যামলী দেখতে পাবে বাস্তব-সত্য। কবি ওকে স্টিল পয়েণ্ট দেখিয়েছেন, সেই অনড়-মুহূর্তের তুরীয় সম্ভাবনার মধ্যে নৃত্য দেখিয়েছেন কবি এলিএট ; কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু ফুসফুসের ফাটা আর্তনাদ তিনি শোনাতে পারেন নি।

মারীয়া আমার দেহসংলগ্ন হয়ে হেলে বসল। বিশ্ব-গ্লোব তার অক্ষের ওপর ঘুরতে লাগল। চব্বিশ ঘণ্টার আহ্নিক গতি শেষ হয়ে গেল।

জেনেভা-হ্রদে ভারতবর্ষের ছায়া পড়ল না।

ঠিক চল্লিশ দিন পর আমি ফিরে এলুম কলকাতায়।

বালিগঞ্জ পার্ক রোডের বাড়িতে এসে উঠলুম। চাকর-দরোয়ানরা কেউ আমায় এত তাড়াতাড়ি দেখবে ব'লে আশা করে নি। কোন কিছুর জন্যে আশা না ক'রে ব'সে থাকবার শিক্ষা আমিই ওদের দিয়েছি। ওদের বুঝিয়েছি, পৃথিবীটা ক্রমে ক্রমে একটা বড় হোটেলের মত হয়ে উঠছে। দশ নম্বর ঘরে কাল যিনি ছিলেন, আজ তিনি নেই। তিনি যখন দমদমের বিমানঘাঁটিতে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন দশ নম্বর ঘরের নতুন প্যাসেঞ্জার নামছেন একটা উড়ো-জাহাজ থেকে। তিনি আসছেন ব'লে হোটেলের দরজায় কেউ হাত বাড়িয়ে ব'সে নেই, তিনি চ'লে যাবেন ব'লে কেউ এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলবে না। এমন একটা নীরব নিয়মানুবর্তিতা আমার চাকর-দরোয়ানদের জীবনকে পরিচালিত করছে যে, বাড়িতে প্রবেশ করবার পর মনে হ'ল, আমি এইখানেই ছিলুম। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে আজও যেন যাওয়া হয়ে ওঠে নি।

শয়ন-কামরা তদারক করবার প্রধান চাকর শঙ্কর এসে ঘরের দু-চারটে জানলা খুলে দিয়ে চ'লে গেল যেমন প্রতিদিন সকালবেলায় করে। আমি ভাল আছি কি না, তাও সে জানতে চাইল না। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মানবতাধর্মী ভৃত্য-গোষ্ঠীর মত চাকর শঙ্কর নয়। শঙ্কর সুযোগ পেলে চুরি করে। হগের বাজারে একটা মাঝারি সাইজের মুরগীর দাম যখন তিন টাকা, শঙ্করের হিসেবের ফর্দে সেই মুরগীরই তখন দাম হয় তিন টাকা আট আনা। আমি ইচ্ছে ক'রেই

ওকে আট আনা এক টাকা চুরি করতে দিই। দিই এই জন্যে যে, এক টাকার চুরি বন্ধ করবার মত সময় আমার নেই। যাকে বৈজ্ঞানিক নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থেকে লাখ লাখ টাকা চুরি করতে হয়, তার সময়ের অভাব—ক্রনিক অভাব।

জানলা খুলে দেওয়ার পর দক্ষিণ দিক থেকে বাতাস আসতে লাগল। আসছ লেক-অঞ্চল থেকে—রাসবিহারী অ্যাভিনিউ অতিক্রম ক'রে। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ আর গড়িয়াহাটার মোড়ে যশোদা ম্যানসনের চারতলার একটা ফ্ল্যাটে আমার বাবা আর মা থাকেন। সঙ্গে থাকে আমার ছোট ভাই অমল। অমল কোথায় যেন একটা চাকরি করে ব'লে শুনেছি। আরও শুনেছি যে, ওর যা মাইনে তাতে যশোদা ম্যানসনের কেন, কোন ফ্ল্যাটেরই ভাড়া দেওয়া চলে না। দেয়ও না। ওরা সব রিফিউজী ব'লে বাড়িটা দখল ক'রে ব'সে আছে। গভর্মেণ্ট সাহস ক'রে তুলেও দেয় না। আসছে নির্বাচনে ওদের কাছেই গভর্মেণ্টের কর্তাদের আসতে হবে ভোট কুড়োতে।

জানলাটা বন্ধ ক'রে দিলুম। দক্ষিণের বাতাসের সঙ্গে একটা গন্ধ আসছিল। যশোদা ম্যানসনের চারতলার ফ্ল্যাটের গন্ধ। পচা চিংড়িমাছ ওঁরা কম মূল্যে কিনে নিয়ে আসেন। এটা তাঁদের নতুন অভ্যাস নয়। আমি তো জন্মাবধি বাবাকে বেলা এগারোটার আগে বাজারে যেতে দেখি নি। বহু বছরের অভ্যাস, তাই ওঁদের কোন গন্ধ-বোধ নেই।

দক্ষিণের সবগুলো জানলাই আমাকে বন্ধ ক'রে দিতে হ'ল। তারা রোডের দূরত্ব এখান থেকে দু মাইলের বেশি নয়। চল্লিশ দিন সুইট্‌জারল্যাণ্ডে থেকে যেটুকু উদ্বৃত্ত-স্বাস্থ্য আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি, সুযোগ পেলে তারা রোডের বীজাণু সেটুকু আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে। কলকাতার বাতাস কোটি বীজাণুর ক্রীড়াভূমি। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সহস্র আইনের ফাঁক দিয়ে বীজাণুগুলো আক্রমণের পথ খুঁজছে। মারীয়ার পয়সার অভাব ছিল, নইলে সে কলকাতার নোংরা মানুষের গায়ে হেলান দিয়ে বসত না। আমার মেরুদণ্ড নুইয়ে পড়লেও মারীয়া তার মুখটা তুলে ধরত না ওপর দিকে।

ঘড়িতে সময় দেখলুম, বিকেল পাঁচটা। শঙ্কর এসে খবর দিলে ডাক্তার দেবেশ দাস এসেছেন। দুপুরবেলাই নাকি সে টেলিফোন ক'রে জেনে নিয়েছে, আমি ফিরে এসেছি। আমার দেহের সব খবরই দেবেশ জানে। প্রতিদিন ভিজিট দিতে হয় না, মাসিক টাকার অঙ্ক বরাদ্দ করা আছে। শোবার ঘরেই ডেকে পাঠালুম দেবেশকে। সে যথারীতি আমার বুক, পেট এবং পিঠ পরীক্ষা করল। জিভটা বার ক'রে দিলুম। কোন রকম কোটিং পড়ে নি। চোখের নীচেটা টেনে টেনে সে দেখলে, কোথাও রক্তস্বল্পতা দেখা যায় কি না! সব রকম টানাটানি এবং টেপাটেপি শেষ ক'রে সে বললে, কোথাও কোন খুঁত নেই।

থাকলে আমি টের পেতুম।—এই ব'লে দেবেশের সামনে সিগারেটের টিনটা খুলে ধরলুম।

কেমন ছিলে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে?—প্রশ্ন করলে দেবেশ।

প্রতিদিন যেমন থাকি, তেমনই ছিলুম। আমার নিয়মানুবর্তিতার বিজ্ঞান আমায় কখনও খারাপ থাকতে দেয় না। মাঝে মাঝে একটু একঘেয়ে লাগে। মনে হয় বগলের ভাঁজে রসুন চেপে রেখে গায়ে একটু জ্বর আনি। যাক সে সব কথা। তোমার গবেষণাগার কেমন চলছে?

চলছে ভালই। দুটো বেড খুলেছি পেশেণ্টের জন্যে। নিজের খরচায়—

খরচা না করলে তোমার গবেষণার ফল পাবে কেন? রক্তে বিষ ঢোকাতে পারলেই তো রক্তের বিষ ফেলতে পারবে। কিন্তু তোমার তো ফুসফুস নিয়ে কারবার? দুটো বেডের জন্যে পেশেণ্ট পেয়েছ?

একটা খালি আছে।

অন্যটায়?

একটি যুবতী পেশেণ্ট পেয়েছি। শুকিয়ে দড়ির মত হয়ে গেছে।

কোথায় পেলে?

রিফিউজী-বস্তিতে।

দেবেশের সিগারেট প্রায় শেষ হয়ে এল। দেবেশ পায়চারি করছিল।

দক্ষিণ দিকের একটা জানলা খুলে দিয়ে সে বললে, বিচিত্র এই দেশ! অনেকটা আলেকজাণ্ডারের উক্তির মত শোনাল। জিজ্ঞাসা করলুম, কোন্ দেশ?

ভারতবর্ষ।—শব্দটা উচ্চারণ ক'রে দেবেশ চেয়ে রইল আকাশের দিকে। সম্ভবত আমার জানলার মধ্যে দিয়ে ও ভারতবর্ষকেই দেখছিল।

অনুরোধ করলুম, তোমার ভারতবর্ষের দু-একটা বৈচিত্র্যের নমুনা দাও।

নমুনা? চল তা হ'লে আমার গবেষণাগারে। মেয়েটিকে দেখবে। দেখবে সবে-স্বাধীন ভারতবর্ষ বিছানার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। সমাজ ও রাষ্ট্র যেন ওর দেহ থেকে একটু একটু ক'রে মাংস ছিঁড়ে নিয়েছে। তবু মেয়েটির মুখে হাসি, বাঁচবার জন্যে সে কি অসাধারণ সংগ্রাম করছে দিনরাত! হয়তো বাঁচবেও।

তোমার নতুন ওষুধের গুণে বোধ হয়?

কেবল ওষুধের গুণে নয়। ওর শুকনো হাড়ের মধ্যে বাঁচবার একটা অদ্ভুত আদিম প্রবৃত্তি আছে—ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার মত, সে ম'রেও মরতে চায় না, এবং হয়তো মরবেও না।—একটু থেমে দেবেশই আবার বললে, আজ রাত্রে আমার দ্বিতীয় পেশেণ্ট আসবে। আমি নিজেই যাব আনতে।

এটিও কি ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৈচিত্র্য?

কেবল বৈচিত্র্য নয়, এ এক ভিন্ন রূপ। চল না আমার সঙ্গে, দেখবে তাকে?

গাড়িতে উঠে দেবেশ জিজ্ঞাসা করলে, বরযাত্রী যাবে?

তুমি কি আমার সঙ্গে ইয়ারকি করছ দেবেশ?

গাড়িটা তখন গড়িয়াহাট রাস্তা ধ'রে রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের দিকে যাচ্ছে।

দেবেশ আমার প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বললে, মেয়েটিকে আমি আজই বিয়ে করব।

মনে হ'ল, দেবেশের সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক রাখা উচিত নয়।

আমি আবার পালিয়ে যাব সুইট্জারল্যাণ্ডে। ভুলে যাব ভারতবর্ষকে। এমন একটা রুগ্ন ভারতবর্ষের নাগরিক হয়ে আমি যেন সত্যি সত্যি অসুস্থই বোধ করতে লাগলুম। অশোক-স্তম্ভের মধ্যে দিয়ে আমি আর পশ্চাতের ইতিহাস দেখতে চাই না। এই তো ভবিষ্যতের ইতিহাস দেখতে পাচ্ছি, যে ইতিহাস যক্ষ্মারোগাক্রান্ত রমণীর ভ্রূণের মধ্যে গিয়ে তার গতির কাহিনী অব্যাহত রাখবে।

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে জিজ্ঞাসা করলুম, নতুন ওষুধের পরীক্ষা করবে ব'লে মেয়েটিকে বিয়ে করছ কেন? কি পাবে তার কাছ থেকে?

কিছু না পেলে কি একটুও কিছু দেওয়া যায় না শম্ভু?

গাড়িটা এসে দেশপ্রিয় পার্কের সামনে থামল। *টি. পি.* পুলিস তার ডান হাতটা উত্তর-দক্ষিণে লম্বাভাবে ছড়িয়ে দিয়ে পূব-পশ্চিমের গতি সব রুখে দিয়েছে।

আবার আমি কপালের ঘাম মুছলুম।

এক রকম বাধ্য হয়েই জিজ্ঞাসা করলুম, ভারতবর্ষে কি গিনিপিগ কিংবা নেংটি ইঁদুরও পাওয়া যায় না দেবেশ? যদি না পাওয়া যায়, তবে চ'লে যাও পশ্চিমে। তুমি কেন এমন অসভ্যতা করতে যাচ্ছ?

অসভ্যতা নয় শম্ভু, মেয়েটিকে আমি বাঁচাতে যাচ্ছি।

পশ্চিমের রাস্তা খুলে দিয়েছে পুলিস। গাড়ি আবার চলতে লাগল।

দেবেশ, তোমার নিজের ফুসফুসের কি হবে? তোমার বিষাক্ত রক্তের ছিটে-ফোঁটায় ভারতবর্ষের ভগ্ন-স্বাস্থ্য ভবিষ্যতে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে না? বিশ্বের মধ্যে আর যা-ই থাক্, যক্ষ্মারোগের ওষুধ নিশ্চয়ই নেই। তোমার ভয় করে না দেবেশ?

না। সব মানুষের যক্ষ্মা এক রকম নয়। অতএব একই ওষুধে সব রকম যক্ষ্মা সারে না। এই মেয়েটির ওপর আমি নতুন ওষুধ প্রয়োগ করব।

হাসি পেল। কলকাতার মেডিকেল কলেজের পাস-করা ডাক্তার দেবেশ

রামায়ণ-মহাভারতের অসংখ্য নায়কের মধ্যে যে-কোন একটি নায়কের মত কথাবার্তা কইছে !

গলির মোড়ে এসে পৌঁছলুম আমরা।

জিজ্ঞাসা করলুম, ওষুধটা বোধ হয় তোমার বিজ্ঞানসম্মত নয় ? এমন কি, গন্ধমাদন থেকেও সম্ভবত নিষ্কাশিত হয় নি ?

না। গন্ধমাদন যে-মূল থেকে নিষ্কাশিত হয়েছে, আমার ওষুধও বোধ হয় সেই একই মূল থেকে প্রক্ষিপ্ত।—এই যে এসে গেছি। এই বাড়িতেই কনে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

চেনা-বাড়ির সিঁড়িতে পা দিলুম।

দেবেশ দেখতে পায় নি, আমার পুরনো পদক্ষেপ এ বাড়ির সিমেণ্টে ফাটল ধরিয়েছে।

তিনতলার সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে দাঁড়িয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নতুন ওষুধটি কি দেবেশ ?

নতুন নয়। আদিম ওষুধের নতুন প্রয়োগ বলতে পার। শম্ভু, এ শতাব্দীর ভগ্ন-স্বাস্থ্য এত বেশি ভেঙে গেছে যে, সুইট্জারল্যাণ্ডের সাদা হাওয়ায় তা আর জোড়া লাগবে না।

হঠাৎ যেন কানে এল, এক নারীকণ্ঠের আবেদন-স্বর—আমায় তুমি পরিত্যাগ করলে কেন ?

শ্যামলী পরিত্যক্তা নয়।

দাঁড়ালুম গিয়ে ওর বিছানার পাশে। আলিঙ্গনে এবার সৃষ্টি হবে নতুন ইতিহাস, যে ইতিহাসের পশ্চাৎ-বন্ধন আমি অস্বীকার করতে পারলুম না। পেছন দিকে চেয়ে দেখি, ডাক্তার দেবেশ অন্তর্হিত হয়েছে।

'শনিবারের চিঠি'
অগ্রহায়ণ, ১৩৬০

মদন মণ্ডলের কলকাতা যাত্রা

কত ধানে কত চাল হয়, মদন মণ্ডল তা ভাল ক'রেই জানত। সমস্তটা জীবন তো সে এক রকম হিসেব করতে করতেই কাটিয়ে দিল। কিন্তু কতটা চাল সেদ্ধ করলে কতটা ভাত হয় এবং কতটুকু ভাত খেলে একটা মানুষের পেট ভরে তার হিসেব সে জানত না। মদন মণ্ডল চাষী। বাংলার চাষী। দু বিঘে জমির মালিক সে। তা ছাড়া, ঘরের সামনেও আধ বিঘের মত জমি আছে। তাতে লাউ কুমড়ো এবং বেগুন জন্মায় প্রতি বছর। মোট ফসলের যোগফল থেকে দু-তিনজনের সংসার মোটামুটিভাবে চ'লে যাওয়া উচিত ছিল। তা চলে নি। কোনদিনও চলে নি। ইংরেজরা চ'লে গেল, কিন্তু মদন মণ্ডলের পেটের ক্ষিধে গেল না।

গত তিরিশ বছরের চেষ্টায় সে তিরিশের বেশি গুনতে শিখল না। শিখল না মানুষকে অবিশ্বাস করতে। মহাজন গদাই মোড়ল তার ফসল সব কিনে নেয়। লাউ-কুমড়োগুলো সাবালক হওয়ার আগেই সে দাদন দিয়ে আসে গদাই মোড়লের কাছ থেকে। এক শো টাকার জিনিস তাকে বেচতে হয় তিরিশ টাকায়। সে শুনেছে, কলকাতায় আর সাহেব-সুবো নেই—সব পালিয়েছে। কলকাতার লাটসাহেব এখন কলকাতারই মানুষ। কিন্তু মদন মণ্ডলের তাতে সুবিধে হয় নি। লাউ-কুমড়োর দাম বাড়ে নি তার এক পয়সাও। নতুন ইতিহাসের দাম বাড়ল অনেক, অথচ তার আয় বাড়ল না তিরিশ টাকার বেশি। তবুও মহাজন গদাই মোড়লকে সে অবিশ্বাস করতে পারল না। অবিশ্বাস করতে শেখে নি বংশীপুরের মদন মণ্ডল।

ঘরে বউ নেই, মারা গেছে প্রায় দশ বছর আগে। গেছে নবীনের জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। মদনের একমাত্র সন্তান নবীন। বংশীপুরের পাঠশালায় সে বার পাঁচেক ভরতি হয়েছে, কিন্তু একসঙ্গে সে ছ মাসও পড়তে পারে নি।

মাইনে যোগাড় হয় না ব'লে নবীনের নাম কাটা যায় স্কুল থেকে। নবীন পড়তে চায়। লেখাপড়ার প্রতি ঝোঁক তার খুব বেশি। নাম কাটা গেলে কি হবে, নবীন এক থেকে এক শো পর্যন্ত গুনতে পারে। গুনতে পারে লাউ-কুমড়োর মোট সংখ্যা।

কলকাতা থেকে চল্লিশ মাইল দূরে বংশীপুর গ্রাম। মাইল পাঁচেক পূব দিকে হেঁটে এলে একটা সরকারী পিচের রাস্তা পাওয়া যায়। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেই রাস্তার ওপর পাঁচ-সাতটা মোটর লরি দাঁড়িয়ে থাকে। এ অঞ্চলের সব কিছু ফসল নিয়ে যায় গদাই মোড়ল কলকাতায়।

নবীন কেবল এক শো পর্যন্ত গুনতেই পারে না, সে যোগ-বিয়োগ শিখেছে। শিখেছে পাঠশালার বাইরে। গদাই মোড়লের ছেলে ফারুক তার সহপাঠী ছিল। ছুটির সময় নবীন পাঠশালার বাইরে অপেক্ষা করত ফারুকের জন্যে। দুজনে এসে বসত একটা গাছের তলায়। ফারুকের কাছে সে শিখে নিলে যোগ-বিয়োগের জটিল কৌশল।

সেদিন ঘুমোতে যাওয়ার আগে নবীন বললে, বাবা, চল আমরা একবার কলকাতা যাই। তুমি তো আজও কলকাতা দেখ নি।

না, দেখি নি। কলকাতা যেতে ভাড়া লাগে। তিরিশ বছর আগেও লাগত। ভাড়া তখন কমই ছিল।

নবীন চুপ ক'রে রইল। কি যেন সে হিসেব করছিল। একটু পর সে বললে, প্রত্যেক বছরে তুমি যদি সওয়া মাইল ক'রে পথ হাঁটতে, তবে তিরিশ বছর লাগত তোমার কলকাতা পৌঁছতে। তিরিশ বছর হ'লেও এতদিনে তুমি পৌঁছুতে পারতে।

ঘুমোবার সময় অঙ্ক কেন নবীন ?

তোমার একবার কলকাতা যাওয়া দরকার।

কেন রে ?

গদাই মোড়ল তোমায় ঠকাচ্ছে। সে দালাল।

দালাল নয়, মহাজন।—শুধরে দিল মদন মণ্ডল।

মহাজন হ'লেও গদাই মোড়ল দালাল। কলকাতা গিয়ে দেখে এস, তোমার দু পয়সার কুমড়ো সে তিরিশ পয়সায় বিক্রি করে।

বলিস কি নবীন, তিরিশ পয়সা!—বিছানায় উঠে বসল মদন মণ্ডল। ছেলের কাছে একটু স'রে গিয়ে খুব নীচু স্বরে বললে, এমন কথা মুখে আনিস নে নবীন। গাঁয়ের ছোঁড়ারা তোকে মিছে কথা বলেছে। গদাই মোড়ল আমার তিরিশ বছরের মহাজন। সে আমায় কিছুতেই ঠকাবে না।

তিরিশ বছর ধ'রেই ঠকাচ্ছে সে। নইলে আমার পাঠশালার মাইনে জোটে না কেন? মাসে মাত্র আট আনা পয়সা বাবা!

সে রাত্রে মদন মণ্ডলের ভাল ক'রে ঘুম এল না।

নবীন যখন জন্মায়, মদন মণ্ডল তখন গদাই মোড়লের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল। বিপদ-আপদের সময় হাত পাতলে গদাই মোড়ল কোনদিনই তাকে ফিরিয়ে দিত না। কিন্তু ঋণের টাকা আর ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি। সম্ভব হয় নি এমন কি দাদনের টাকাও পুরোপুরি মিটিয়ে দেওয়া।

সেদিন গদাই মোড়ল এল মদনের ঘরের সামনে। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল আধ বিঘের বাগান। কুমড়োগুলো প্রায় পেকে এসেছে। লাউগুলোয় নখ বসিয়ে গদাই মোড়ল দেখলে, হ্যাঁ, লাউগুলো কচিই বটে। দু-চারদিনের মধ্যেই কলকাতা চালান দেওয়া দরকার। শহরের বাবুরাও লাউয়ের গায়ে নখ বসিয়ে পরীক্ষা ক'রে তবে লাউ কেনেন। লাউ-চিংড়ির তরকারিতে বিচি থাকলে চলবে কেন? অফিসে যাওয়ার মুখে বাবুদের তাড়াতাড়ি খাওয়া, গলায় যদি আটকে যায়? সেই জন্যেই বাবুরা বেশি পয়সায় কচি লাউ কেনেন। গদাই মোড়ল আজ এসেছে দরাদরি করতে নয়, ঋণের টাকাটা মদন মণ্ডলকে স্মরণ করিয়ে দিতে। ফসল তোলবার আগে সে প্রতিবারই স্মরণ করিয়ে দেয়।

হাতের ছড়িটা মাচার দিকে তুলে ধ'রে গদাই মোড়ল বললে, এসব কুমড়ো কলকাতার বাবুরা আজকাল আর খেতে চায় না।

কেন মোড়ল সাহেব ?—জানতে চাইল মদন মণ্ডল।

বড্ড জ'লো জ'লো লাগে।

পাকা কুমড়োর স্বাদ মদন মণ্ডল জানে না। তাই গদাই মোড়লের কথাটা এক রকম স্বীকার ক'রে নিয়েই সে বললে, তোমার কথা তো মিথ্যে হবার নয় মোড়ল সাহেব। কিন্তু এসব কুমড়োর জাত খুব ভাল।

ভাল ?—ধমকে উঠল গদাই মোড়ল, ভাল হ'ল কবে থেকে শুনি ? আজ তিরিশ বছর কারবার করবার পর আমায় কুমড়োর জাত দেখাচ্ছিস মদন ?

তা নয়। কিন্তু কুমড়োর জাত খুব ভাল। বোঁটার চারদিকে দেখছ লাল পদ্মের মত ছাপ পড়েছে ?

মাচা থেকে ঝুলে-পড়া একটা কুমড়োর দিকে সারস পাখির মত মুখটা এগিয়ে দিয়ে গদাই মোড়ল বললে, লাল পদ্ম ? ওটা তো কুষ্ঠব্যাধির রঙ, ভেতরে যে পচন ধরেছে। শহরের বাবুরা ওসব জিনিস ছোঁবে না। মদন, তোর চোখে বোধ হয় ছানি পড়েছে।

তা বোধ হয় পড়েছে। সারা জীবন তো কেবল দেখেই গেলাম মোড়ল সাহেব, পেট ভরল না। দেখার তৃষ্ণা আমার মিটেছে। কিন্তু লাল পদ্মর ছাপ আমি ঠিকই দেখেছি। কুমড়োর রগে রগে রস। এ জাতের কুমড়ো মধুর চেয়েও মিষ্টি।

তুই কলকেতা যা মদন, চোখের ছানি কাটিয়ে আয়।

তাই যাব ভাবছি, অনেক দিনের সাধ মোড়ল সাহেব। যাব যাব ক'রে তিরিশটা বছর কেটে গেল।

গদাই মোড়ল পরিষ্কার বুঝতে পারলে, তার সাবেক চাল আজ ব্যর্থ হয়েছে। তারই তৈরী বিশ্বাসের রাস্তা ধ'রে মদন মণ্ডল পার হয়ে এল তিরিশটি বছর। আজ যেন সেই রাস্তা দিয়ে মদন আর হাঁটতে চায় না। সে চায় কলকাতায়

যেতে। বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করাই দালালদের প্রধান কাজ। গদাই মোড়ল পাকা দালাল। পাকা কুমড়োর গায়ে সে তাই ব্যাধি দেখতে পেয়েছে। আলোচনাটা ঘুরিয়ে দিল গদাই মোড়ল নিজেই। বললে, কুমড়োর জাত তোর খুবই ভাল মদন। কিন্তু বংশীপুরের মাটিতে বজ্জাতি ঢুকেছে। সার দেওয়া দরকার।

সার কেনবার পয়সা পাব কোথায় মোড়ল সাহেব?

পয়সার অভাব আমারও। ফারুক এবার কলকাতা যাবে। বড় ইস্কুলে পড়বে সে। ঋণের টাকাটা তুই শোধ দিবি নে মদন?

মদন মণ্ডল এবার ভাল ক'রে চাইল মাচার দিকে। চোখে বোধ হয় এবার সত্যি সত্যি ওর ছানি পড়ছে। বোঁটার চারদিকে লাল পদ্মর ছাপ আর নেই। মদন যেন দেখতে পেল, কুমড়োগুলোর সারা অঙ্গে কুষ্ঠব্যাধির ঘা। ঘেন্নায় মাছিগুলোও বুঝি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে! বাবুদের কাছে এমন জিনিস বিক্রি হবে কেন?

এসব মাল বেচতে পেরেশানের অন্ত নেই মদন।—বড্ড পেরেশান। কিন্তু তোর তো পয়সা না হ'লেও চলবে না। দিস, যখন তোর সুবিধে হয় টাকা ক'টা ফিরিয়ে দিস।—এই পর্যন্ত ব'লে গদাই মোড়ল জিজ্ঞাসা করলে আবার, মাচার ওপর কটা কুমড়ো আছে রে?

তুমি তো পাইকারি দরে কিনবে, গুনে লাভ কি মোড়ল সাহেব?

পাইকারি কিনলেও মোট সংখ্যা তো একটা থাকা চাই।

ক'টা হবে, এই ধর, বিশ-বাইশটা।

হ্যাঁ, তুই ঠিক বলেছিস মদন। বাইশটা নয়, বিশটাই হবে। গদাই মোড়ল পকেট থেকে দুটো পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে তুলে ধরল মদনের দিকে। তারপর বললে, কাল সকালে আমার লোক আসবে, লাউ-কুমড়োগুলো দিয়ে দিস। চল্, তোর ঘরটা একবার দেখে আসি।

ঘর? ঘর দেখলে কোথায়?—জিজ্ঞাসা করল মদন।

কেন, তোর ঘরটা উবে গেল না কি?

ওটা কি আর ঘর মোড়ল সাহেব! কোন রকমে ছেলেটাকে নিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকি। তোমার মত ধনী মহাজনরা ওসব জায়গায় দু দণ্ড দাঁড়াতেও পারবে না।

দাঁড়াব না, একবার উঁকি দিয়ে দেখে আসব...দু-একটা লাউ-কুমড়ো ছেলেটা তোর পেড়ে নিয়ে যায় নি তো?—গদাই মোড়ল পা বাড়াল যাওয়ার জন্যে। মাচার পিছন থেকে বেরিয়ে এল নবীন। বললে, দাম যা দিলে, তাতে বিশটা কুমড়োই পাবে।

গদাই মোড়ল অবাক হয়ে চেয়ে রইল নবীনের মুখের দিকে। সে জিজ্ঞাসা করলে, বিশটা কেন?

নবীন জবাব দিলে, তুমি তো বললে, মাচার ওপর বিশটা কুমড়ো আছে!

ক'টা আছে ব'লে তোর মনে হয়?

সাতচল্লিশটা।

কতর পিঠে কত দিলে সাতচল্লিশ হয় রে পুঁচকে ছোড়া?

চারের পিঠে সাত।

বটে! বংশীপুরের পাঠশালায় অনেক লেখাপড়া শিখেছিস দেখছি? পাঠশালার টিনগুলো এবার খুলে নিয়ে আসব। পণ্ডিত ব্যাটা আজও আমার একটা টাকাও শোধ দেয় নি। এসব বড় বড় অঙ্ক কোথায় শিখলি রে নবীন?

শিখলাম ফারুকের কাছে। সে তো গুণ-ভাগ সব শিখে ফেলেছে। বাবাকে ঠকিয়ে ঠকিয়ে তুমি যে আমাদের সর্বনাশ করছ, ফারুকও তা জানে।

শুনলি মদন? ছোঁড়া কি লঙ্কা-বাটা খেয়েছে নাকি? মুখে অত ঝাল কেন? বলি ও মদন, চারের পিঠে সাত দিলে যে সাতচল্লিশ হয় তাও তুই বিশ্বাস করবি নাকি?

মদন মণ্ডল মাথা নেড়ে বললে, তা কখনও হয় মোড়ল সাহেব! তুমি কখনও মিথ্যে বলবে না। বলতে পার না। নবীন জন্মেছে দশ বছর আগে,

আর তোমার সঙ্গে আমার কারবার চলছে তিরিশ বছর হ'ল। তিরিশ বছরের বিশ্বাস নবীন কি ক'রে উল্টে দেবে?

নামাজ পড়বার সময় হ'ল, এবার আমি চলি মদন।

মাচাটা খালি হয়ে গেছে সাত দিন আগেই। মদন মণ্ডল শূন্য মাচার দিকে চেয়ে ছিল অনেকক্ষণ পর্যন্ত। ক্রমে ক্রমে তার মনের মধ্যেও কি রকম একটা শূন্যতা-বোধ আসতে লাগল। প্রতি বছরই আসে। এ শূন্যতা-বোধ তার কেবল মনের নয়, দেহেরও। পেটের নাড়ি বোধ হয় নারকেলের দড়ির মত শুকনো হয়ে উঠেছে। প্রায়ই তাকে উপোস করতে হয়। উল্লেখ করতে হয় নবীনের কানের কাছে যে, পেটের ব্যারাম তার ক্ষুৎপিপাসা সব হরণ ক'রে নিয়েছে। ব্যারাম তার পেটের নয়, ব্যারাম বোধ হয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার। ইংরেজ গেল ব'লে মদন মণ্ডলের কোন সুবিধেই হ'ল না। গদাই মোড়লেরও যাওয়া দরকার। যাওয়া দরকার দালাল-গোষ্ঠীর। কিন্তু মদন মণ্ডল সেসব কথা বোঝে না। সে বোঝে না, মানুষ কখনও মানুষের মুখের অন্ন কেড়ে নিতে পারে! মাত্র চল্লিশ মাইল দূরের কলকাতা শহরের পেটের পরিধি যে কত বড়, মদনের তা কল্পনা করা সম্ভব নয়। মদন জানে না, কলকাতার ক্ষিধে তার মাচাটাকে খালি ক'রে দিয়েছে। প্রতি বছরই দেয়। তবুও গদাই মোড়লকে সে অবিশ্বাস করতে পারে না। তিরিশ বছরের নির্ভরতা কেড়ে নিতে পারে না কলকাতার ক্ষিধে। বংশীপুরের মাটি কলকাতার চেয়েও বড়। পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতার শেকড় আজও বোধ হয় বংশীপুরের মাটিতে বেঁচে-ব'র্তে আছে। আছে নিশ্চয়ই, নইলে পাঠান, মোগল এবং ইংরেজরা পারে নি মদন মণ্ডলকে কলকাতা টেনে নিয়ে যেতে। পেটের নাড়ি শুকিয়ে গেলেও মনের বিশ্বাস ভাঙে নি। মানুষকে অবিশ্বাস করলে মদন মণ্ডল বাঁচত না। কলসীর কাণায় মাথা ফাটলেও, হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। টেনে নিতে হবে বুকে। কলকাতার হাত যদি তার ডান গালে চড় মারে, বাঁ গালটি তাকে এগিয়ে

দিতে হবে দ্বিতীয় আঘাতের প্রতীক্ষায়। এই তো নিয়ম, এই তো সভ্যতা।

নবীন এসে দাঁড়াল মদনের গা ঘেঁষে।

কি রে, কোথায় গিয়েছিলি?—জিজ্ঞাসা করল মদন।

ফারুক আজ কলকাতা গেল। বড় ইস্কুলে পড়বে।—নবীন তার ডান হাতটা সামনের দিকে এনে আবার বললে, এই ছেঁড়া বইগুলো ফারুক আমায় দিয়ে গেছে।

কি করবি বই দিয়ে?

বড় বড় অঙ্ক শিখব। আমি গুণ-ভাগ শিখে ফেলেছি বাবা।

জমি তো আমাদের মাত্র দু বিঘে। অত বড় বড় অঙ্ক শিখে লাভ কি নবীন?

গদাই মোড়ল সাতচল্লিশকে বিশ ব'লে চালাচ্ছে বহু বছর থেকে। তার ভুলটা ধ'রে দিতে হবে না?—প্রশ্নটা যেন বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় প্রশ্নের মত শোনাল। মদন মণ্ডল অতটা বুঝল না। সে বললে, গদাই মোড়লের ভুল আমরা ধরতে যাব কেন? এ রাজ্যে কি পুলিস-চৌকিদার নেই নবীন?

তারাও যে গদাই মোড়লকে সাহায্য করছে বাবা।—নবীনের মন্তব্যে তার আত্মপ্রত্যয়ের সুরটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল। মদন মণ্ডলের ঐতিহাসিক বিশ্বাস-ভূমিতে যেন একটু দোলা লাগল। গদাই মোড়লকে অবিশ্বাস করতে গেলে মদন মণ্ডল বাঁচবে কি নিয়ে?

নবীন বললে, বাবা, চল একবার কলকাতা যাই। ফারুকের বড় ইস্কুলটাও দেখে আসব, আর—। নবীন হঠাৎ থেমে গেল।

আর কি?—জিজ্ঞাসা করল মদন।

আর বাজারে গিয়ে দেখে আসব লাউ-কুমড়োর দর।

তেমন একটা ইচ্ছে মদনেরও ছিল। আজ ক'দিন থেকে কলকাতা যাওয়ার ইচ্ছেটা ওকে পীড়া দিচ্ছিল খুব। কলকাতার বাজারে লাউ-কুমড়োর দর দেখতে গিয়ে গদাই মোড়ল যদি ধরা পড়ে? কি দরকার তার কলকাতা গিয়ে

অবিশ্বাসের বিষ নিয়ে আসবার? সে চাষী, মাটির বাইরে তার দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়।

শেষ পর্যন্ত নবীন তার বাবাকে ছাড়ল না। একদিন তাই মদন মণ্ডল দেড়খানা টিকিট কেটে নবীনকে নিয়ে চেপে বসল রেলগাড়িতে। দেড়খানা টিকিটের লোকসান আজ আর লোকসান ব'লে মনে হ'ল না মদনের। কারোরই হয় না। সত্যদর্শনের জন্য মানুষ জীবন দেয়। মদন মণ্ডল দিচ্ছে কেবল দেড়খানা টিকিটের দাম। এ লোকসান সে নিজে না পারুক, নবীন একদিন পুষিয়ে দেবেই। আগামী দিনের যুবক নবীন হয়ে উঠবে গত পাঁচ হাজার বছরের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। সে ঠকবে না, সে অস্বীকার করবে গদাই মোড়লের মহাজনী শোষণ-কর্তৃত্বকে। কলকাতার বাজারে দাঁড়িয়ে সে সত্য দর্শন করবে। হিসেব ক'রে দেখবে, লোকসানের কড়া-ক্রান্তি। নবীন অঙ্ক কষতে জানে। যোগ-বিয়োগের সীমা ছাড়িয়ে সে গুণ-ভাগের চূড়ায় গিয়ে উঠতে শিখেছে। তার ন্যায্য ভাগ থেকে সে কিছুতেই বঞ্চিত হবে না। বঞ্চিত হতে দেবে না তার বাবাকেও। নবীনের উদ্যম আজ রেলের গতিকেও হার মানাতে চায়।

সে ছুটেছে শহরের বাজারে। বাজার-সভ্যতার শহরে চলেছে বংশীপুরের মদন মণ্ডল।

শেয়ালদা স্টেশনের বাইরে এসে ওরা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। যন্ত্র-সভ্যতার বিস্ময় ওদের বিচলিত করল না মুহূর্তের জন্যে। ওরা বিস্মিত হতে আসে নি। ওরা এসেছে সত্য দর্শন করতে। দেখতে এসেছে গদাই মোড়লের গোপন চেহারা। মানুষের ভিড় তাই ওদের গায়ে লাগল না। কারও দিকে চেয়ে দেখবার সময় নেই ওদের।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, বাজার কোন্ দিকে বাবা?

মনে হচ্ছে ইষ্টিশন থেকেই বাজারের শুরু।—জবাব দিল মদন।

লাউ-কুমড়ো কই?—নবীন চেয়ে রইল মদনের দিকে।

দুজন ভলান্টিয়ার এগিয়ে এল ওদের কাছে। একজন জিজ্ঞাসা করলে, তোমরা রিফিউজী নাকি? বাস্তুহারা?

পুরীর পাণ্ডাদের মত ওরা লেগে রইল মদন মণ্ডলের গায়ের সঙ্গে। মদন তবু জবাব দিতে পারছে না। দ্বিতীয় নম্বর ভলান্টিয়ার নবীনের হাত ধ'রে মারল এক টান। বললে, চল, নাম লিখিয়ে দেব। কোন্ জেলা থেকে এসেছ? ঢাকা, না নোয়াখালি?

মদন মণ্ডল বললে, আমরা এসেছি বংশীপুর থেকে, বারাসত বাজারের পাঁচ ক্রোশ পুবে। আমরা এসেছি কলকাতার বাজার দেখতে।

বাজার?—ধমকে উঠল ভলান্টিয়ার, কোন্ বাজার?

নবীন বললে, যেখানে আমাদের লাউ-কুমড়ো বিক্রি হয়।

ধৈর্য হারিয়ে ফেলল ভলান্টিয়াররা। ধৈর্য হারিয়ে দুজনে দুটো সিগারেট ধরিয়ে গোটা পাঁচেক টান মারল পর পর। শেয়ালদা স্টেশনে ওরা অনেক রকমের আহাম্মক দেখেছে, কিন্তু সামনে-দাঁড়ানো দেড়-টিকিটের দেড়খানা আহাম্মক ওরা এই প্রথম দেখল। সরকারী দাদনের সুবিধে না দেখে এরা দেখতে চাইছে লাউ-কুমড়ো! উনিশ শো পঞ্চাশ সালে বাপ-ব্যাটাতে মিলে শেয়ালদা স্টেশনে খুঁজে বেড়াচ্ছে লাউ-কুমড়োর বাজার! সারা কলকাতার মাছিগুলো পর্যন্ত এখানে উড়ে এসেছে খেয়ে মরবার জন্যে। বোধ হয় এই সব কথা ভেবেই ভলান্টিয়ার দুজন একসঙ্গেই হেসে উঠল।

নবীন বললে, বাবা, চল আমরা ফিরে যাই।

ভলান্টিয়ার একজন মদনের আগেই ব'লে বসল, যাবে কেন, লাউ-কুমড়ো খেয়ে যাও।

আমরা লাউ-কুমড়ো খাই না, বেচি।—জবাব দিল নবীন।

তাই নাকি? শেয়ালদা বাজারে তাই এক ফালি কুমড়োর দাম চার আনা!

কোন্ বাজারে বললেন বাবু ?—জানতে চাইল মদন মণ্ডল।

শেয়ালদা বাজারে। ওই তো সামনেই, নাক বরাবর চ'লে যাও।

একটু পরে বাপ-ব্যাটাতে মিলে চলতে লাগল নাক বরাবর।

মদনের একটা হাত চেপে ধ'রে নবীন বললে, বাবা, বড্ড ভয় করছে।

কেন রে ?

যদি আমরা হারিয়ে যাই ?—নবীন মদনের হাতটা আরও শক্ত ক'রে চেপে ধরল। কিন্তু একবার যখন শহরের রাস্তায় নেমে পড়েছে, তখন নবীনকে এ হাত একদিন ছেড়ে দিতেই হবে। একালের একটা শতাব্দীও পারছে না গত পাঁচ হাজার বছরের হাতটাকে ধ'রে রাখতে। ধ'রে রাখতে চায়ও না।

ভিড়ের পেছনে পেছনে কোন রকমে রাস্তা পার হয়ে ওরা পৌঁছে গেল বৈঠকখানা বাজারে। এক মিনিটের জন্যেও নবীনের মুঠো আলগা হ'ল না। কেঁচোর মত লেপ্টে রইল মদনের গায়ের সঙ্গে। কিন্তু মদন ক্রমশই বিচলিত হয়ে উঠছে। দোকানীকে সে জিজ্ঞাসা করলে, এই এক ফালি কুমড়োর দাম কত ?

চার আনা।

চার আনা! গোটা কুমড়োটার দাম ?

এক টাকা ছ আনা।

মদন মণ্ডল এবার কাটা-কইমাছের মত ছটফট করতে লাগল। তার তিরিশ বছরের বিশ্বাসের কুমড়োটাকে বুঝি কেউ আর বাঁচিয়ে রাখতে পারল না। ক্রমে ক্রমে সেটা ফালি হতে লাগল। দু-দশটা নয়, দু-চার হাজার ফালি। দোকানীদের বঁটিগুলো ধারের আভিজাত্যে জেল্লা মারছে খুব। মদন মণ্ডল পরখ ক'রে দেখলে, একটা কুমড়োর বোঁটার চার দিকে লাল পদ্মর ছাপ রয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করলে, এক ফালি কুমড়োর এত দাম কেন ?

এ যে খুব ভাল জাতের কুমড়ো গো।—জবাব দিল দোকানী।

নবীনের দৃষ্টিতে জয়ের আড়ম্বর। কিন্তু মদন চাইতে পারল না নবীনের চোখের দিকে। পা দুটো যেন তার কাঁপছে। রাগে নয়, লজ্জায়। বাংলার

চাষী রাগ করতে পারে না, পারে ক্ষমা করতে। গদাই মোড়লকেও সে ক্ষমা করবে। কিন্তু—

মদন মণ্ডল হঠাৎ দেখতে পেল, একটু দূরেই গদাই মোড়ল পাইকারদের হাত থেকে টাকা নিচ্ছে। অনেক টাকা। সে ডাকলে, মোড়ল সাহেব—

গদাই মোড়ল টাকার বাণ্ডিলটা পকেটে রেখে মুখ ঘুরিয়ে দেখলে, মদন আর নবীন এগিয়ে আসছে তারই দিকে।

গদাই মোড়ল আর অপেক্ষা করতে পারল না। সে উল্টো দিকে পা বাড়াল। পেছন থেকেই মদন মণ্ডল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, টাকা আমি চাই নে মোড়ল সাহেব। একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করব।

এ শতাব্দী মদন মণ্ডলের কোনও কথাই শুনতে আর রাজী নয়। শুনতে গেলেই ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝখানে সভ্যতা-দালালটি ধরা পড়বে। মদন মণ্ডল এসব কথা বুঝতে পারে না। সে ছুটল গদাই মোড়লের পিছু পিছু। দোকানদারদের মধ্যে কলরব উঠল। ভয় পেয়ে নবীনও ছুটল মদনের দিকে। কেঁদে উঠল নবীন, বাবা, আমাকে ফেলে কোথায় যাচ্ছ? এ প্রশ্নের জবাব মদন আর দিতে পারল না। সে তখন ট্রাম রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, বাজারের বাইরে। মদন দেখেছে, গদাই মোড়ল তার পকেটটা চেপে ধ'রে রাস্তা পার হয়ে গেল। ট্রামের রাস্তা। মদন মণ্ডল ছুটল ট্রামের রাস্তা দিয়েই।

গেল, গেল, গেল—চেঁচিয়ে উঠল শহরের বাবুরা।

মদন মণ্ডল সত্যিই গেল। সে যাচ্ছিল অনেক দিন আগে থেকেই।

মদনের দেহটা দু-ফালি কুমড়োর মত প'ড়ে রইল ট্রাম লাইনের দু ধারে। ওতে লাল পদ্মের ছাপ নেই, আছে রক্ত। গঙ্গা-যমুনার জলের মত রক্তের স্রোতও গতিশীল। ত্রিবেণী-সঙ্গমের পুণ্য এতে না থাক্, মাটির সত্য এতে রইল।

'গল্প-ভারতী'
চৈত্র ১৩৬০

টাইফয়েড

মাধবীলতা অসুখ থেকে উঠল। খুব বড় রকমের অসুখ। টাইফয়েড। একুশ দিন পরে জর ছেড়ে গেল। মাধবীলতার বাবা রাজেন রায় অফিস থেকে ছুটি নিয়েছেন এক মাসের। গত একুশ দিনের মধ্যে একটা দিনও তিনি অফিসের কথা ভাবেন নি, ভাবেন নি আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের কথা। মায়ের অবস্থা আরও গুরুতর হয়ে উঠেছিল। হেমনলিনী দেবী সেই যে মেয়ের বিছানার পাশে এসে ব'সে পড়েছিলেন, আজ একুশ দিন পরে তিনি যেন বিছানা থেকে তাঁর নিজের অস্তিত্ব আলাদা ক'রে ভাবতে পারছেন।

রাজেনবাবু বললেন, মাধবী এখন ঘুমুচ্ছে, তুমি চান ক'রে নাও। তারপরে একটু কিছু মুখে দিয়ে ঘণ্টা দুই তুমিও ঘুমিয়ে নিও।

মাধবী যদি আমায় খোঁজে ?—হেমনলিনী দেবী যেন প্রশ্নটার জবাব চাইলেন না। চেয়ে রইলেন মেয়ের মুখের দিকে। রাজেনবাবু তাঁর স্ত্রীর মধ্যে একটা গভীর উদ্বেগের লক্ষণ দেখতে পেলেন।

কি দেখছ হেম ?

দেখছি ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। টাইফয়েড রোগটা তো ভাল নয়, একটা কিছু দাগ সে রেখে যায়। ডাক্তার এলে ওষুধ-পথ্যির কথা ভাল ক'রে জেনে রেখো। আর—। চুপ ক'রে রইলেন রাজেনবাবুর স্ত্রী।

'আর' কি ?

আর তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে রেখো যে, মেয়ের মধ্যে তিনি তেমন কোন ক্ষতি দেখতে পাচ্ছেন কি না !

না, না—ক্ষতি কিছু হয় নি। আর হ'লেও তো কোন উপায় নেই। বেঁচে যে গেছে এই যথেষ্ট।—অভয় দিলেন রাজেনবাবু।

আচ্ছা, আমি যাচ্ছি চান করতে। ডাক্তারবাবু এলে আমায় ডেকে পাঠিও।

একটু বাদেই ডাক্তারবাবু এলেন। মাধবীকে ভাল ক'রে পরীক্ষা করলেন তিনি। পরীক্ষা শেষ ক'রে ডাক্তার সেন ঘোষণা করলেন, আর কোনও ভয়ের কারণ নেই।

মাধবীলতা চেয়ে ছিল ডাক্তার সেনের দিকে। রাজেনবাবুর মনে হ'ল, মাধবী যেন এখনও গত একুশ দিনের ভয়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারে নি। জীবন-নৌকোটা যেন ঝড় পার হয়ে এইমাত্র ঘাটে এসে লাগল। ঘাটের বাস্তব মাধবীর চোখে অদ্ভুত রকমের এক বিস্ময় সৃষ্টি করেছে।

রাজেনবাবু বসলেন এসে মেয়ের কাছে। ওর হাতটা তুলে নিলেন নিজের মুঠোর মধ্যে। আঙুলের চাপে অনুভব করলেন তিনি, মাধবীর হাতে মাংসের ছিটেফোঁটাও নেই। মেয়ের হাতে মাংসের ছিটেফোঁটা খোঁজবার জন্যে মাধবীলতার হাতটা তিনি তুলে নেন নি। রাজেনবাবু চেয়েছিলেন একুশ দিনের ঘুমন্ত মেয়ের দৃষ্টিটা তাঁর নিজের দিকে ফিরিয়ে আনতে। ডাক্তারদের দিকে অমন ক'রে দৃষ্টি না দেওয়াই ভাল। মাধবীর হয়তো তাতে ভয়ের মাত্রা বাড়বে।

হেমনলিনী দেবী ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই তাঁর দৃষ্টি পড়ল মেয়ের চোখের দিকে। মাধবীলতার দৃষ্টিটা যেন তাঁর কাছে খুবই অস্বাভাবিক ঠেকল। ডাক্তার সেনের দিকে অমন ভাবে চেয়ে আছে কেন? কৃতজ্ঞতা? আট বছরের মেয়ের পক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভঙ্গি এটা নয়, ভাবলেন হেমনলিনী দেবী।

ডাক্তার সেন চ'লে যাচ্ছিলেন। মাধবীলতা অতি ক্ষীণস্বরে ডাকলে, ডাক্তারবাবু! ডাক্তার সেন দাঁড়ালেন। আমায় ডাকছ মা?—এই ব'লে তিনি ফিরে এলেন মাধবীলতার কাছে। রাজেনবাবুর হাতের মুঠো থেকে সে তার হাতটা টেনে নেবার জন্যে একটু চেষ্টা করতেই রাজেনবাবু ওর শীর্ণ হাতটা তুলে ধরলেন ডাক্তার সেনের দিকে। তুলে ধরতে চেয়েছিল মাধবীলতা নিজেই।

আমায় ফেলে কোথায় যাচ্ছিলেন ডাক্তারবাবু?

তোমায় ফেলে যাচ্ছিলুম না মা, রেখে যাচ্ছিলুম। কাল আবার আসব আমি। তুমি তো ভালই হয়ে গেছ।

আপনি কাছে না থাকলে আবার আমার অসুখ বাড়বে।

তোমার অসুখ আর একটুও নেই। দু-তিন দিনের মধ্যেই তো তুমি ভাত খাবে। দেখুন রাজেনবাবু, মাধবীর জন্যে কি মাছ আনবেন বলুন তো? মাগুর মাছ। কিন্তু সেদিন যদি না পাওয়া যায়? এক কাজ করুন আপনি। কাল সকালে আপনি নিজেই একবার লেক বাজারে যান। চাকর-বাকরের ওপর নির্ভর করবেন না। মাছগুলো তো ওদের হাঁড়ির মধ্যে দু-চারদিন থাকে আবদ্ধ হয়ে। মিসেস রায়, আপনাদের চৌবাচ্চা নেই?

আছে, বেশ বড় চৌবাচ্চা আছে।—বললেন হেমনলিনী দেবী।

তা হ'লে দু দিন আগেই মাছগুলোকে এনে চৌবাচ্চায় ছেড়ে দিলে ভাল হবে। মাগুর মাছের স্বাস্থ্যের ওপরেই এখন মাধবীলতার স্বাস্থ্য নির্ভর করবে। তা হ'লে—। ডাক্তার সেন মাধবীর হাতটা বিছানার ওপর নামিয়ে রেখে বললেন, তা হ'লে এবার আমি চললুম। আরও তো রোগী দেখতে হবে মা। তুমি এবার ঘুমিয়ে পড়।

ঘুমুতে আমার ভয় করে।—বললে মাধবীলতা।

ভয়? ভয় কিসের?—জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তার সেন।

আপনি কাছে না থাকলে আমার ভয় করে ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার সেনের মত ব্যস্ত ডাক্তারের পক্ষে মাধবীলতার ভয় সম্বন্ধে গবেষণা করা সম্ভব নয়। গবেষণা করা তো দূরের কথা, চিন্তা করারই বা সময় কই? চিন্তা করতে গেলেই সময় নষ্ট হয়, অতএব টাকা নষ্ট হয়।

একতলায় নেমে যাচ্ছিলেন ডাক্তার সেন। পেছন থেকে হেমনলিনী দেবী ডাকলেন, ডাক্তারবাবু! পেছন থেকে কেউ ডাকলে ডাক্তার সেন অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেন। বিরক্ত বোধ করবার কারণ আছে। কারণ না থাকলে

অতবড় একজন ডাক্তার বিরক্ত বোধ করবেন কেন? কারণটা যেন কি? ও, হ্যাঁ, পেছন থেকে কেউ ডাকলে তাঁর প্রফেশনের বড্ড বেশি ক্ষতি হয়। দিনটা তাঁর ভাল যায় না। রোগীর সংখ্যা ক'মে যায়, অতএব টাকার অঙ্ক বাড়ে না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মধ্যে পেছু ডাকের রহস্য কেমন ক'রে যে এসে খানিকটা জায়গা দখল ক'রে নিয়েছে, সে কথা ভেবে ডাক্তার সেন মাঝে মাঝে খুবই বিস্ময় বোধ করেন। কিন্তু বেশিক্ষণ বিস্মিত হয়ে ব'সে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। টেলিফোনের আওয়াজ তিনি শুনছেন। তিনি ছুটে আসেন তাড়াতাড়ি ক'রে টেলিফোন ধরতে।

'হ্যালো? কে?—ও, আপনি? না, খোকা বাড়ি নেই।' রোগী-বাড়ি থেকে টেলিফোন আসে নি। নতুন রোগীর কাছ থেকে টেলিফোন আজ আর আসবে না। সকালবেলাই সর্বনাশ হয়ে গেছে। খোকার মা পেছন থেকে তাঁকে ডেকে ফেলেছিলেন। খোকার মা মানে নিজেরই স্ত্রী। সুতরাং মুখ বুজে তাঁকে পেছু-ডাক সহ্য করতে হয়েছে। আজ আবার বার বার দুবার তিনি পেছু-ডাক শুনলেন। বাকি দিনটার কি অবস্থা হবে তা তিনি রাজেনবাবুর বাড়ির সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খানিকটা অনুমান করতে পারলেন।

ডাকছেন আমায়?—সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তার সেন। না ডাকলে তিনি দাঁড়ালেন কেন? স্থান পরিবর্তন না করলে, হয়তো পেছু-ডাকের ক্ষতি খানিকটা রুখতে পারবেন তিনি। তা ছাড়া ক্ষতি কেবল তাঁর একলারই হয় না, রোগীর ক্ষতিও হতে পারে। ক্ষতি হতে পারে মাধবীলতারও।

হেমনলিনী দেবী বললেন; টাইফয়েড রোগটা তো ভাল নয়—

হোক না খারাপ, আপনাদের তাতে ভয় কিসের? অসুখ তো সেরেই গেছে। দু-তিন দিন বাদেই ভাত দেব। তাজা মাগুরের সুপ পেটে পড়লে দশ দিনের মধ্যে মাধবীলতা গায়ে-পায়ে গজিয়ে উঠবে সাঁই সাঁই

ক'রে। বড্ড বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে মিসেস রায়, আমায় যেতে হবে শ্যামবাজার।

কিন্তু টাইফয়েড তো শুনেছি কোন একটা কিছু নষ্ট না ক'রে যায় না?

মেয়ে তো আপনার সামনেই রয়েছে, কোন কিছুই ওর নষ্ট হয় নি। হাত-পা নাড়ছে, কথা কইছে এবং স্মরণশক্তিও আছে পুরোপুরি। লেখাপড়ায় কেমন ছিল আপনার মেয়ে?

খুব ভাল। ক্লাসের প্রথম মেয়ে ছিল মাধবীলতা।

থাকবেও তাই। ভয় করবেন না। হাঁড়িতে আবদ্ধ মাগুর মাছগুলোকে ছেড়ে দিতে বলবেন চৌবাচ্চায়। টাটকা জল পেলে ওদের শরীরের জড়তা যাবে কেটে—ব্লাড সারকুলেশন ভাল হওয়া চাই। নইলে স্যুপের মধ্যে আর থাকবে কি? আচ্ছা, আমি এবার চলি।—চলি ব'লেও তিনি সিঁড়ি থেকে নড়লেন না। মিসেস রায় ওখান থেকে না গেলে তিনি যেতে পারছেন না। যেতে ভয় পাচ্ছেন। আবার যদি মিসেস রায় পেছন থেকে ডাকেন? প্রোফেশনের ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েই গেছে, এবার ডাকলে রোগীর ক্ষতি তিনি আর আটকাতে পারবেন না। এই ভেবে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন ব'লে হেমনলিনী দেবীও ওখান থেকে নড়লেন না এক ইঞ্চিও। একটু পরেই ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত মনে হ'ল তাঁর কাছে। ডাক্তার সেন কেন অপেক্ষা করছেন?

ডাক্তার সেন, আমায় কিছু বলবেন?—জিজ্ঞাসা করলেন মিসেস রায়।

না, যা বলবার সবই তো ব'লে গেলাম। আচ্ছা, আমি চলি—

পেছন থেকে রাজেনবাবু ডাকলেন, ডাক্তার সেন!

ডাক্তার সেন জবাব দিলেন না, উঠে এলেন ওপরে। এলেন বেশ দ্রুত-গতিতে। রোগীর অবস্থা খুব খারাপ ব'লে খবর না পেলে বড় ডাক্তাররা সাধারণত এত দ্রুতভাবে সিঁড়ি ভাঙেন না। ডাক্তার সেন রাজেনবাবুর সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হ'ল, জ্বরটা রি-ল্যাপ্‌স্ করল না কি?

কই, গা তো ওর গরম নয়।

তবে?

মাধবী আপনাকে একবার ডাকছে।

এক ভিজিটে রোগীকে দেখতে হ'ল দুবার। তার ওপরে তিনবার পেছু-ডাক, তাও তাঁকে সহ্য করতে হ'ল।

কি মা, কি হয়েছে?—কপালে হাত রাখলেন ডাক্তার সেন।

ভয় করছে।—বললে মাধবীলতা।

কিসের ভয়?—জানতে চাইলেন ডাক্তার সেন।

আপনি কাছে না থাকলে এখানে আমি একলা একলা থাকব কি ক'রে?

কেন, মা বাবা তো রইলেনই।

ডাক্তার কেউ কাছে না থাকলে আমি বাঁচব না।

কোনও ভয় নেই মা, মাগুর মাছের স্যুপ পেটে পড়লে, ভয়-ডর সব পালিয়ে যাবে মন থেকে। মিসেস রায়, শরীরে স্বাস্থ্য না এলে, ভয়ের ভূত ওর মনে চেপে ব'সে থাকবে। থাকবেই। কিন্তু তাতে অস্থির হবার কোন কারণ নেই, ওসব স্নায়বিক দুর্বলতা, মানে—। আচ্ছা, আচ্ছা, নমস্কার।

কাউকে আর ডাকবার সুযোগ না দিয়ে ডাক্তার সেন দৌড়ে নেমে গেলেন নীচে।

তার পরে প্রায় পাঁচ বছর অতীত হয়েছে। রঙ ধরেছে মাধবীলতার স্বাস্থ্যে। হাত-পা সব ঠিকই আছে। চোখের দৃষ্টি কমে নি একটুও। মগজের হানি হয় নি তিলেকমাত্র। লেখা-পড়ায় মাধবীর মাথা আগের মতই প্রখর। ক্লাসে সে এবারও প্রথম হ'ল। বেশি নম্বর পেল গেলবারের চেয়ে। মা-বাবার স্ফূর্তি হ'ল মেয়ের চেয়েও বেশি। টাইফয়েড দাঁত বসাতে পারে নি কোথাও।

কিন্তু ইস্কুল থেকে ফিরে এসে মাধবীলতা শুয়ে পড়ে বিছানায়। হেমনলিনী

দেবী মেয়ের পেছনে পেছনে ছুটে আসেন ঘরে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কি রে মাধু, শুয়ে পড়লি যে ?

মাথাটা আমার ধরেছে মা।

তোর বাবাকে বলি ওষুধ দিতে ?

বাবার ওষুধে সারবে না।

মাথা ধরার ওষুধ তো সব দোকানেই কিনতে পাওয়া যায়।—ব'লে হেমনলিনী দেবী মাধবীলতার মাথা টিপে দিতে থাকেন।

মাথা ধরার ওষুধ তো কদিনই খেলুম, কিন্তু সারে কই ? ডাক্তারকে ডাক মা।—মাধবীলতা পাশ ফিরল।

একটু মাথা ধরার জন্যে রোজ রোজ কি ক'রে ডাক্তার ডাকা যায় ?

তা হ'লে মাইনে দিয়ে বাড়িতেই একজন ডাক্তার রাখ।—ও-পাশ ফিরেই বললে মাধবীলতা।

সে কি কথা মাধু ? মাথা ধরা কিংবা সর্দি-কাশি তো এমন কিছু ভয়ের ব্যারাম নয় ?

মুখ ঘুরিয়ে মাধবীলতা বললে, হাতের কাছে ডাক্তার না থাকলে আমার বড্ড ভয় করে মা।

কেন ?

মনে হয়, আমি যেন কোন্ এক অজানা অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি। ডাক্তার ছাড়া কেউ আমায় সেখান থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

হেমনলিনী দেবী ভাবলেন একটু। ডাক্তারের সাহায্য ছাড়াই ব্যাপারটা তিনি বুঝে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এমন অদ্ভুত ধরনের ভয় মেয়ের মনে এল কি ক'রে ?

তিনি মেয়ের কপালে হাত রেখে বললেন, তোর মনে আছে কি না জানি না, একবার তোর টাইফয়েড হয়েছিল। একুশ দিন পরে জ্বর ছেড়ে যায়। একুশ দিনের সেই আচ্ছন্ন ভাবটা তোর মন থেকে বোধ হয়

আজও কাটে নি। সত্যিই, তোর মাথা ধরেছে ব'লে আমার বিশ্বাস হয় না মাধু।

তবে আমার কি হয়েছে?—প্রশ্ন করলে মাধবীলতা।

তোর কিছুই হয় নি।

আমার বোধ হয় তা হ'লে আবার টাইফয়েড হয়েছে। কিংবা টাইফয়েড হয়তো আমার কোনদিনও সারে নি মা।

দুই

আঠারো বছর বয়সে মাধবীলতা আই. এস-সি. পাস করল। বেশ ভাল ভাবেই পাস করল।

ওর পাস করা উপলক্ষ্যে রাজেনবাবু ও হেমনলিনী দেবী তাঁদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের একদিন নেমন্তন্ন করলেন।

সকালবেলায়ই মা জিজ্ঞাসা করলেন, মাধু, তোর কলেজের বন্ধুদের কাউকে বলবি না?

ও, হ্যাঁ, রমলাকে তো বলতেই হবে। তা ছাড়া মিঠু—মিঠুর ভাল নামটা যেন কি? অতি সহজ ও পরিচিত নামগুলো মাঝে মাঝে ভুলে যাই মা। যাক, ভাল নাম না জানলেও চলবে, মিঠুকে টেলিফোন ক'রে ব'লে দিলেই হবে। গাড়িটা পেলে অবিশ্যি আমারই যাওয়া উচিত। কোথায় যেন থাকে? ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে কলেজ স্কোয়ারের ও-পাশটায়। আচ্ছা মা, আর যদি দু-একজনকে বলি? দুজন নয়, একজনকে বললেই আমায় আর কেউ দোষ দিতে পারবে না।

হেমনলিনী দেবী চেয়ে ছিলেন মেয়ের দিকে, কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন না। মাধবীলতার চোখে যেন কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব আজও রয়েছে, রয়েছে ভয়ের চিহ্নও। কথাগুলো ও ব'লে গেল বটে, কিন্তু বললে যেন

অন্য কোন এক অজানা দেশ থেকে। এখানে সে উপস্থিত নেই। প্রায় সময়েই সে এখানে উপস্থিত থাকে না। থাকতে ভয় পায় মাধবীলতা। ওর আজও বিশ্বাস, হাতের কাছে একজন ডাক্তার না থাকলে যে-কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। কপালের ওপরে ছোট্ট একটা ফুসকুড়ি উঠেছিল ব'লে মেয়ের সে কি কান্না! দু দিন তো কলেজেই গেল না। বাবার কাছে গিয়ে মেয়ে পরামর্শ করতে লাগল, আমাকে তুমি মেডিকেল কলেজে ভরতি ক'রে দেবে বাবা। আমি ডাক্তার হব নিজেই। কারও ওপর আমি নির্ভর করতে চাই নে।

তোমার তো মা আমি গত দশ বছরের মধ্যে কোন অসুখ হতে দেখি নি, তবে কেন দিন-রাত ডাক্তার হওয়ার কথা ভাবছ?—জিজ্ঞাসা করলেন রাজেনবাবু।

বল কি বাবা, অসুখ আমার সারল কই? একবার যার টাইফয়েড হয়, সে চিরকাল ভোগে। আমি ডাক্তারি পড়বার জন্যেই তো আই. এস-সি. পড়েছি।

রাজেনবাবু মেয়ের কথা বুঝতে পারেন না। গত দশ বছরের মধ্যে তিনি বোঝবার চেষ্টাও করেন নি।

আজকে নেমন্তন্ন করবার কথা উঠতেই হেমনলিনী দেবী মেয়ের চোখের মধ্যে স্বাভাবিকতা দেখলেন না। কথার মধ্যেও ওর অসংলগ্নতার সুর রয়েছে। ব্যাপার কিছুই তিনি বুঝতে পারলেন না, দশ বছর ধ'রে বুঝতে পারছেনও না। তিনি বললেন, গাড়ি নিয়ে যাও। রমলাকে গিয়ে আগে নেমন্তন্ন ক'রে এস। তার পরে মিঠুর কাছে যাও। আর একজন কোথায় থাকে বললে না তো?

আর একজন—মানে, মিঠুর দাদা। ডাক্তারি পড়ে। তোমাদের অবিশ্যি আপত্তি থাকলে আমি কক্ষনো নেমন্তন্ন করতে যাব না।

না, না, আপত্তি থাকবে কেন? আমাদের নাম ক'রে তাকে নেমন্তন্ন করিস। মিঠুর দাদার নাম কি রে?

নাম? এই দেখ, ভাল নামটা তো মনে নেই!

ডাক-নামটা জানলেই হবে।

কি দরকার তোমাদের জেনে? মানে, কদিনই আর দেখা হয়েছে বল?

তবুও নামটা তার না জানলে আমরা কি ব'লে ডাকব মাধু!

সে তো ঠিক কথাই মা। আমি তো 'শম্ভুদা' ব'লেই ডাকি। মিঠু ডাকে, তাই আমাকেও ডাকতে হয়।

মিঠুর বাবা কি কাজ করেন?

সে আমি জানি না। তাঁকে আমি কখনও দেখিও নি। কোন অফিসে খুব সাধারণ একটা কাজ করেন ব'লে শুনেছি। ডাক্তার হ'লে কত টাকাই না তিনি রোজগার করতে পারতেন!

তা হ'লে তুই যা, নেমন্তন্নটা সেরেই আয়। উনি সঙ্গে যাবেন মাধু?

গেলে তো খুবই ভাল হয়, শম্ভুদাকে বাবাই বলতে পারেন। কিন্তু—। থেমে গেল মাধবীলতা—কিন্তু বড্ড নোংরা বাড়িঘর। বাবার গিয়ে কাজ নেই। শম্ভুদা হয়তো মনে করবে, নোংরা বাড়িঘর দেখাবার জন্যেই বাবাকে ডেকে নিয়ে গেছি। গরিব লোকেদের অপমানবোধ বেশি হয়, তা কি তুমি জান না মা?

জানি ব'লেই তো প্রথমে আমি তোকে একলাই যেতে বলেছিলুম।

হ্যাঁ, সেই ভাল।—এই ব'লে মাধবীলতা গিয়ে ঢুকল নিজের ঘরে। দাঁড়াল এসে আয়নার সামনে। চুলটা বেঁধে নিল ভাল ক'রে। শাড়িটা টেনে-টুনে ঠিকঠাক ক'রে নিতে ওর পাঁচ মিনিটও লাগল না। এমন সুন্দর স্বাস্থ্য, তাই সময় নষ্ট ক'রে সাজবার প্রয়োজনই হয় না মাধবীলতার।

মেয়ে বেরিয়ে যাবার পরে হেমনলিনী দেবী এলেন স্বামীর কাছে। রাজেনবাবুর অফিস নেই—রবিবার। আরাম-কেদারায় পা ছড়িয়ে দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন তিনি।

হেমনলিনী দেবী বললেন, মেয়ের এবার বিয়ের ব্যবস্থা কর।

খবরের কাগজে চোখ রেখেই রাজেনবাবু বললেন, দিল্লী থেকে দেবেনবাবুর এখনও কোন জবাব আসে নি।

এদিকে মেয়ে যে কোন্ এক শম্ভুদাকে নেমন্তন্ন করতে গেল!—বললেন, হেমনলিনী দেবী।

শম্ভুদা?—রাজেনবাবু খবরের কাগজটা ফেলে রাখলেন মেঝের ওপর, বললেন, শম্ভুদা কে?

ডাক্তারি পড়ে, থাকে কলেজ স্কোয়ারের ও-দিকটায়। বোধ হয় কোন এঁদো গলি-ফলি হবে। নতুন মডেলের অষ্টিন গাড়িও হয়তো গলিতে ঢুকবে না। মেয়ে তো গাড়ি নিয়েই বেরিয়েছে।

কই, আমি তো কিছুই জানি না!

জানলেই বা কি করতে?

ট্যাক্সি ক'রে যেতে বলতুম। আমার নতুন অষ্টিনের দফা সেরে দেবে আজ হয়তো!

না, ড্রাইভার তোমার পাকা আছে। কিন্তু তোমার অষ্টিনের চেয়ে মেয়ের ভবিষ্যৎটা কি বড় নয়? ওর ভবিষ্যৎটা যদি নষ্ট হয়ে যায় ওই গলির মধ্যে?

কি ক'রে?—নতুন অষ্টিন থেকে এবার রাজেনবাবু তাঁর মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে এসে ফেললেন মেয়ের ওপর।

হেমনলিনী দেবী বললেন, মেয়েটা যায় সেখানে মাঝে মাঝে। শম্ভুদার বোন মিঠু ওর বন্ধু।

পাগল না কি! শম্ভুদা, না, ঘোড়ার ডিম। মেয়ে আমার তেমন আজেবাজে কাজ করতেই পারে না। তা ছাড়া, দেবেনবাবুর ছেলে রামানন্দকে আমি আজ নেমন্তন্ন করেছি। মাধবীর সঙ্গে আজ ওর প্রথম পরিচয় হবে।

কিন্তু ওর শম্ভুদার সামনে এসব হবে কি ক'রে?—জিজ্ঞাসা করলেন হেমনলিনী দেবী।

তাই তো, ম্যানেজ না করতে পারলে ব্যাপারটা তো বায়স্কোপের মত ইন্‌টারেস্টিং হয়ে উঠবে।

মেয়েকে নিয়ে এসব হালকা রসিকতা করতে যেও না।

রসিকতা নয় হেম, আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লুম। একে তো ওর মাথায় রয়েছে টাইফয়েডের গোলমাল, তার ওপরে আবার এসে জুটল শম্ভুদা। না, কি করি বল তো? শম্ভুদাকে আলাদা ঘরে বসানো যায় না?—রাজেন-বাবুর কথায় হালকা সুর ভেসে উঠল ব'লে হেমনলিনী দেবী মেঝে থেকে খবরের কাগজখানা নিয়ে স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দুপুরবেলা মাধবীলতা বসবার ঘরখানা ভাল ক'রে সাজিয়ে রাখলে। রাজেনবাবু সাজালেন নিজের অফিস-ঘরটা। শম্ভুদাকে এখানে এনে মাধবী যদি বসায়, তা হ'লে কোন আর অসুবিধে হবে না। হেমনলিনী দেবীর মনের ভয় কাটবে। কাটলও।

সন্ধ্যের সময় সবাই এলেন। রামানন্দ এল সবার শেষে। মাধবীলতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন রাজেনবাবুই। ভাল ছেলে, কোন এক কলেজে যেন সবে ঢুকেছে ছাত্রদের পড়াবার জন্যে। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক রামানন্দ দাশগুপ্ত। সে যদি কেবল অধ্যাপকই হ'ত, তা হ'লে রাজেনবাবু মাধবীলতার বিয়ের প্রস্তাব ক'রে রামানন্দর বাবার কাছে চিঠি লিখতেন না। দেবেনবাবু দিল্লীতে মস্তবড় একজন ডাক্তার। প্রচুর টাকা জমিয়েছেন। লেক-অঞ্চলে জমি কিনে রেখেছেন। ভাল একজন কনট্রাক্টরের সন্ধান পেলেই তিনতলা বাড়ি তিনি এই শীত না ফুরোতেই তুলে ফেলবেন ব'লে সব ঠিক ক'রে রেখেছেন। রামানন্দের কাছে এই সম্বন্ধে দেবেনবাবু একটা বড় চিঠিও লিখেছেন। ইট, সুরকি, সিমেন্ট ইত্যাদির দরদস্তুর সবই তিনি লিখেছেন রামানন্দর কাছে। কলকাতার বাজারদর সম্বন্ধে দেবেনবাবুর জ্ঞান পাকা এবং নির্ভুল। ডালমিয়ার সিমেন্টের সঙ্গে রোটাসের খাঁটি সিমেন্টের দামের কতটা ফারাক তাও তিনি লিখেছেন রামানন্দের কাছে। আর কার কাছেই বা লিখতেন তিনি? ছেলে তো ওই একটি। দেবেনবাবুর স্ত্রী সেই জন্যে

রামানন্দকে নীলমণি ব'লে ডাকতেন। তিনিই কেবল ডাকতেন নীলমণি ব'লে। কিন্তু তিনিও মারা গেছেন আজ তিন বছর হ'ল।

ইট, সুরকি আর সিমেণ্টের বাজারদর সব আলোচনা করবার পর দেবেন-বাবু চিঠিতে 'পুনশ্চ' দিয়ে লিখেছেন : রাজেনবাবুর মেয়েটি খুবই ভাল। সেন-হাটির বংশ, অতএব আপত্তি করবার কি আছে? রাজেনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে বিয়ের তারিখটা তুমি ঠিক ক'রে নিও। তোমার সম্বন্ধে তাঁরা নিশ্চয়ই সব খবর নিয়েছেন। লেক অঞ্চলে দশ কাঠা জমি আমি কিনে রেখেছি প্রায় এক লাখ টাকা দিয়ে, তা কি ওঁরা জানেন? এই চিঠিখানা ওঁদের দেখাবে, তা হ'লে ওঁরা ইট-সুরকি ইত্যাদির দাম থেকে পুরো বাড়িটার মোট খরচ ধরতে পারবেন। আমি একটা আনুমানিক অঙ্ক লিখে দিলুম—তিন লাখ। তোমার সম্বন্ধে আর ওঁরা কি জানতে চান? ভবানীপুরে আমার একটা ওষুধের দোকান আছে, তার খবর ওঁরা রাখেন না। ঠিকানাটা তুমি তাঁদের জানিয়ে দিও। সেখানে যে দিবারাত্র ওষুধ তৈরি এবং বিক্রি হয়, সে খবরটা ওঁদের জেনে রাখা ভাল। ওষুধের দরকার হ'লে এবার থেকে ওঁরা ভবানীপুর থেকেই যে ওষুধ আনবেন, সে সম্বন্ধে আমি এক রকম নিশ্চিন্ত হয়েই রইলাম। কেন থাকব না? ডাওয়ারি ব'লে তো আমি কিছুই নিলাম না। আর ওঁরা তোমার সম্বন্ধে কি জানতে চান? সার্ গজেনের আমলে তুমি যদি এম্. এ. পাস করতে পারতে, তা হ'লে তিনিও তোমায় লুফে নিতেন, বসিয়ে দিতেন বড় অফিসের বড় চেয়ারে। কিন্তু এম. এ. পাস করা তো দূরের কথা, সার্ গজেনের আমলে তুমি কোথায় ছিলে, আমি তা জানতুম না। আমি নিজে তখন জন্মেছি কি? তোমার সম্বন্ধে আর কি ওঁরা জানতে চান? আমি নিজেও তো আর কিছু জানি না। কোথায় কি একটা কাজ যেন তুমি করছ ব'লে আমি শুনেছি। শোনাবার মত হ'লে ওঁদেরও তুমি শোনাতে পার। আমার মত দিয়ে রাজেনবাবুকে আজকেই আমি চিঠি দিলাম। সময়মত চিঠির জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, দিল্লীতে এখন

এপিডেমিক। পাঞ্জাব থেকে গাদা গাদা রিফিউজি এসেছে—মন্ত্রীদের কাজ বেড়েছে প্রচুর। তার ওপরে আবার এপিডেমিক। কোন্ দিক সামলাই বল তো? পাঞ্জাবের রিফিউজিরা আমাদের ওদিককার মত একেবারে সর্বহারা নয়। অনেকে কাঁড়ি কাঁড়ি পাকা সোনা সঙ্গে এনেছে—স্বাস্থ্য যা এনেছে, দেখলে মনে হয় সবাই এরা মস্কো-ডাইনামোর হয়ে ফুটবল খেলে। দিল্লীর এপিডেমিক বড় সাংঘাতিক ব্যারাম নীলমণি। বিয়ের ব্যাপারটা যতটা পার নিজেই ম্যানেজ ক'রে নিও। তুমি নিজে গিয়ে মেয়েটিকে দেখে আসবে। ফোটোর ওপর বিশ্বাস ক'রো না। রাজেনবাবু তাঁর মেয়ের একখানা ফোটো আমায় পাঠিয়েছেন। দেখে আমার নিজেরই তাক লেগে গেছে। মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবার মত ছবি! আমেরিকার ফিল্ম-শিল্প ছাড়া অন্য কোথাও এত বড় শিল্প জন্মায় ব'লে আমার বিশ্বাস হয় না খোকা। অতএব তুমি নিজে গিয়ে দেখে আসবে। সব পাকাপাকি ক'রে আমায় চিঠি দিলে আমি দু দিনের জন্যে কলকাতায় যাব। মে মাসের দিকে বিয়ের তারিখটা পড়লে ভাল হয়, প্রধান মন্ত্রী তখন দিল্লীতে থাকবেন না। এখানকার লোক একটু হালকা বোধ করবে। খবরের কাগজ পড়বার জন্যে কাউকে তখন ভোর রাত্রেই ঘুম থেকে উঠে ব'সে থাকতে হবে না। আমার রোগীদের মধ্যে অনেকেই খবরের কাগজ প'ড়ে প'ড়ে নার্ভের বারোটা বাজিয়েছে। আমার আশীর্বাদ নিও। ইতি—

রামানন্দ চিঠিখানা সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে। ড্রইং-রুমের ভিড়ের মধ্যে ব'সে সে চিঠিখানা রাজেনবাবুর হাতে দিয়ে বললে, বাবার চিঠি।

আমায় লিখেছেন?—জিজ্ঞাসা করলেন রাজেনবাবু।

না, আমার কাছে লেখা বটে, কিন্তু আসলে বোধ হয় আপনার জন্যেই তিনি লিখেছেন। এত বড় চিঠি বাবা আমায় লেখেন না।

তুমি পড় নি?

এক পাতা পড়েছি। এক পাতার বেশি হ'লে আমার বড্ড অসুবিধে হয়।

কি অসুবিধে ?

সময় ক'রে উঠতে পারি না। আমার নিজের আবার লেক্‌চার তৈরি করতে হয়। আমি যে কলেজে পড়াই, বাবা বোধ হয় তা জানেন না। জানলেও মনে রাখতে পারেন না। খুবই ব্যস্ত, বড় ডাক্তার কিনা !

ড্রইং-রুমের উপস্থিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের মুখে বেশ একটু প্রচ্ছন্ন হাসির আভাস দেখতে পেলেন রাজেনবাবু। মাধবীলতার কিন্তু ভাল লাগল রামানন্দকে। সেটা বুঝতে পেরেই রাজেনবাবু ঘোষণা করলেন, রামানন্দর সঙ্গে মাধবীর বিয়ের প্রস্তাব আজ পাকা হয়ে গেল। দেবেনবাবুর চিঠি আমি এই একটু আগেই পেয়েছি।

গুরুজনেরা সবাই আশীর্বাদ করলেন মাধবীলতা ও রামানন্দকে। খাবারের টেবিলে গিয়ে সবাই বসলেন। হেমনলিনী দেবী নিজের হাতে পরিবেশন করবার জন্যে দাঁড়িয়ে রইলেন ঘরের মধ্যেই। আনন্দের আতিশয্যে রাজেনবাবু ছানার ডালনা খেতে ভুলে গেলেন। হাজার রকমের আলোচনা নিয়ে তিনি মেতে উঠলেন। অফিস সংক্রান্ত ব্যাপার থেকে শুরু ক'রে ফুটবল খেলা পর্যন্ত সব রকম গল্পগুজবই চলতে লাগল। মাধবীলতা বসেছে রামানন্দর ঠিক উল্টো দিকে। বসিয়েছেন রাজেনবাবু নিজেই। টেবিলের চারদিকে একটা চেয়ারও খালি নেই। খালি রাখেন নি রাজেনবাবুই। খবরের কাগজ নিয়ে সকালবেলাটা নষ্ট করলে কি হবে, তাঁর সাংসারিক বুদ্ধি অসাধারণ। তিনি অন্তত মনে করেন, অসাধারণ। শম্ভুদার জন্যে রাজেনবাবু একটা চেয়ারও খালি রাখেন নি। মাধবীর শম্ভুদা বোধ হয় আর আসবে না। এলেও তিনি তাঁর অফিস-ঘরে সব ম্যানেজ ক'রে ফেলবেন। রামানন্দর সামনে তাকে না আনলেই হ'ল।

হেমনলিনী দেবী মাধবীলতার দিকেই চেয়ে ছিলেন। ভাবী জামাইয়ের মধ্যে দেখবার কিছু ছিল না। রামানন্দ কেবল সুশ্রী নয়, বড়লোক। লেক-অঞ্চলে দশ কাঠা জমি আছে, ভবানীপুরে আছে একটা ওষুধের দোকান।

তার ওপরে সে কলেজ থেকেও আয় করে কিছু টাকা। অতএব, রামানন্দর মধ্যে দেখবার কি আছে? রামানন্দকে দেখছেন তো মাধবীর মীরা-পিসীমা। চোখ দিয়ে তিনি যেন রামানন্দকে গিলছিলেন। মীরা-পিসীমার মেয়ে নন্দরাণী বি. এ. পাস ক'রে ব'সে আছে প্রায় বছর দুই হ'ল, আজও সুযোগ্য পাত্র একজন জুটে উঠল না। নন্দরাণী ব'সে ছিল রামানন্দর এক পাশেই। মন্দ মানায় নি, ভাবলেন মীরা-পিসীমা।

বিরিয়ানির স্তূপ থেকে একটা মুরগীর ঠ্যাঙ বার ক'রে তিনি অনেকক্ষণ থেকে নাড়াচাড়া করছিলেন। খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না তাঁর। তিনি ভাবছিলেন, বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই পাকা হয় না। অতএব—

মীরা-পিসীমা মাধবীর দিকে চেয়ে বললেন, ও কি হচ্ছে মাধু? ছানার ডালনার সঙ্গে দই-মাছ মেখে ও কি করছ মাধবী? ওই দেখো, মাংসের ঝোলটা আবার ওতে মিশিয়ে ফেললে!

হেমনলিনী দেবী একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বললেন, মেয়েটা বড্ড বেশি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে—লেখাপড়া নিয়ে মাধু চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকে।

ব্যস্ত না থাকলে পরীক্ষায় এত ভাল করতে পারত না। সায়ান্স নিয়ে পড়া তো আর চারটিখানি কথা নয় হেম। বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন আমার মাধবীলতা।—বললেন রাজেনবাবু।

রাজেনবাবুর কথায় সায় দিল রামানন্দ। দিয়ে সে বললে, কলেজের কমন-রুমে ব'সে আমি গেজেট দেখছিলুম, খুবই ভাল করেছেন উনি।

কিন্তু—। আসল কথাটা বলবার সুযোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ভেবেই মীরা-পিসীমা তাড়াতাড়ি ক'রে গলায় সহানুভূতির স্বর তুলে বললেন, তুমি যাই বল বড়দা, মাধবী কিন্তু মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব কাজ ক'রে বসে।

কি রকম?—কৌতূহল দেখালেন নন্দরাণীর বাবা দুর্গারতনবাবু। স্ত্রীর উদ্দেশ্য তিনি ধরতে পেরেছেন।

মীরা-পিসীমা রামানন্দের দিকে চেয়ে বললেন, সেদিন তো মাধবী গিয়ে

উপস্থিত নন্দরাণীর কাছে। দুপুরবেলাই হবে। পরীক্ষার বোধ হয় তখনও মাস দুই বাকি। গিয়ে বললে যে, সে আর পরীক্ষা দেবে না। মেডিকেল কলেজে ভরতি হবে। নন্দরাণী শুনে তো অবাক! আই. এস-সি. পাস না ক'রে মেডিকেল কলেজে ভরতি হবে কি ক'রে? মাধবীর বিশ্বাস, শম্ভুদা ওকে ভরতি করিয়ে দেবে। শুনে আমি কি বললুম, জান বড়দা?

রাজেনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, না তো।

আমি বললুম, মাধু, শম্ভুদাকে দিয়ে তোর মাথাটা একবার পরীক্ষা করিয়ে নে। বছর দশেক আগে তোর একবার টাইফয়েড হয়েছিল।—এই ব'লে খুব সরল হাসি হাসবার চেষ্টা করতে লাগলেন মীরা-পিসীমা।

খাবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ডাক্তার সেন। শেষের কথাগুলো শুনলেন তিনি। এগিয়ে এসে বললেন, শম্ভুদা ব'লে কোন ডাক্তারের নাম তো আমি টেলিফোন গাইডে দেখি নি? মাধুর চিকিৎসা তো করেছিলুম আমি। আমার নিজের তো তিনটি মেয়ে আর তিনটি ছেলে। এই ছটির মাথা একসঙ্গে করলেও, আমার মাধু-মার মত এমন জোরালো মাথা হবে না।—ডাক্তার সেন দাঁড়ালেন গিয়ে মাধবীর পেছন দিকে। রাজেনবাবু অত্যন্ত লজ্জায় প'ড়ে গেলেন। ডাক্তার সেনকে তিনি এমন দিনে নেমন্তন্ন করেন নি। ডাক্তার সেনের কথা তাঁর মনেই ছিল না। মনে থাকবার কথাও নয়। গত দশ বছরের মধ্যে মাত্র বার-দুই তাঁকে ডাকতে হয়েছে। ডাকতে হয়েছে হেমনলিনীর জন্যে, মাধবীর জন্যে নয়। মাধবীলতার পেছনে দাঁড়িয়ে ডাক্তার সেন বললেন, রোগী দেখে বাড়ি ফিরতে প্রায় বেলা একটা বেজে গিয়েছিল। এসে দেখি, মাধু-মা আমার ব'সে আছে। সেই সকাল থেকে এসে অপেক্ষা করছিল নেমন্তন্ন করবার জন্যে। টেলিফোন করলেও আমি আসতুম।

এবার মাধবীলতা মুখ তুলে বললে, আপনার ওখানে ব'সে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ডাক্তারের বাড়িতে আমার ঘুম আসে ভাল। জান মা, দেখি

হয়ে গেল ব'লে আর কাউকে আমি নেমন্তন্ন করতে পারি নি। রমলা, মিঠু— এরা সব কি ভাববে ?

কেউ কিছু আর ভাববে ব'লে হেমনলিনী দেবীর মনে হ'ল না। ভাবনার যা তার সবটুকুই রইল এখন রামানন্দর। টাইফয়েড এবং শম্ভুদা দুটোই সে শুনল। শুনিয়ে দিলেন মীরা-পিসীমা। এখন ভগবানের ওপর নির্ভর ক'রে ব'সে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

খাওয়া শেষ হ'ল। সবাই উঠে পড়লেন। মীরা-পিসীমার প্লেটে অনেক খাবার প'ড়ে রইল। নন্দরাণী অবিশ্যি ভাল ক'রেই খেয়েছে।

সবার শেষে উঠল রামানন্দ। উঠে সে রাজেনবাবুকেই জিজ্ঞাসা করলে, বাবাকে তবে কি লিখব ?

রাজেনবাবু যেন এখানে উপস্থিত ছিলেন না, অন্য কোন্ এক জায়গা থেকে ঘুরে এলেন। রামানন্দর প্রশ্নটা তিনি বুঝি শুনতেই পান নি, এমন ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যিই তো, বাবাকে তুমি আর কি লিখবে ?

আপনি বললেই আমি লিখতে পারি। মে মাসের দিকে দিনটা হ'লে বাবার পক্ষে খুব সুবিধেই হয়।

ও, হ্যাঁ। বিয়ের দিন আমি মে মাসেই ঠিক করব রামানন্দ। দেবেনবাবুর সুবিধে আমাদের দেখতেই হবে।

দ্বিতীয় বার মাধবী ও রামানন্দ সবার কাছে আশীর্বাদ পেল। আশীর্বাদের বন্যা নামালেন ডাক্তার সেন। আশীর্বাদ তিনি শেষ করলেন এই ব'লে যে, দেবেন তাঁর সহপাঠী ছিল। তার প্রচুর পয়সা আর প্রচুর হাতযশের সংবাদ তিনি রাখেন। মাধবীলতা লাকি। লাকি রামানন্দও।

সবাই চ'লে যাওয়ার পরে বাড়িটা খুব নির্জন মনে হ'ল মাধবীলতার কাছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে দেখতে লাগল ভাল ক'রে। কোথাও সে খুঁত পেল না এতটুকু। খুঁত কেবল তার মনের। সে ভেবেছিল, একজন ডাক্তারের সঙ্গে ওর বিয়ে হবে। মিঠুদের বাড়িতে সে যেত শম্ভুদার সঙ্গে

দেখা করতে। শম্ভুদা ডাক্তারি পড়ছে, সেইটেই ছিল ওর কাছে একটা মস্তবড় বাস্তব। তার সঙ্গে দেখা হ'লেই ওর মনের মধ্যে কোন রকম আশঙ্কাই থাকত না। মাধবীলতার সর্বক্ষণের ভয় ছিল যে, ডাক্তার কাছে না থাকলে সে আবার তলিয়ে যাবে একুশ দিনের আচ্ছন্নতায়। মাধবীলতার মনের মধ্যে টাইফয়েড বুঝি চিরদিনের জন্যে র'য়েই যাবে।

পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন হেমনলিনী দেবী। তিনি এলেন ওর ঘরের মধ্যে। জিজ্ঞাসা করলেন, রামানন্দকে কেমন লাগল ?

খুব ভাল।

খুশি হয়েছিস তো ?

না।

কেন ?

আমার বোধ হয় একজন ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে হ'লেই ভাল হ'ত মা।

তোর শম্ভুদার সঙ্গে বিয়ে হ'লে আমি আত্মহত্যা করতুম মাধবী। আমায় সমাজ ও সংসারের নিয়মকানুন সব মেনে চলতে হয়।

হেমনলিনী দেবীর পায়ের ধুলো নিয়ে মাধবীলতা বললে, আমায় আশীর্বাদ কর, আমি যেন রামানন্দকে সুখী করতে পারি।

বেঁচে থাক মা সতীলক্ষ্মী হয়ে।—মাধবীলতার গালে চুমু খেলেন হেমনলিনী দেবী।

তিন

বিয়ের পরে পাঁচটা বছর কেটে গেল।

মাধবীলতা প্রমাণ করলে যে, তার মত সতীলক্ষ্মী হিন্দু-ভারতবর্ষের সর্বত্রই পাওয়া যায় না। খুঁজে বার করতে হয়। রামানন্দকে খুঁজতে হয় নি, মাধবী-লতা নিজেই এসেছে ওর কাছে। আসার পর থেকে মাধবী আর নড়ে-চড়ে

নি। পাঁচ বছরের মধ্যে একটা দিনও সে সুস্থ থাকে নি। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর দার্শনিক রামানন্দ মাধবীলতাকে ওষুধ খাওয়ালে আর মাথা টিপে দিলে বিছানার পাশে ব'সে। পঞ্চম বর্ষের শেষের দিকে রামানন্দ নিজের বিছানা আলাদা ক'রে নিয়ে এল তিনতলার ঘরে—প্রকাণ্ড সেই লাইব্রেরি-ঘরটায়।

দেবেনবাবু মারা গেছেন। লেক অঞ্চলের তিনতলা বাড়িটা তৈরি ক'রে তবে তিনি মারা গেলেন। ভবানীপুরের ওষুধের দোকানটা খুব ভাল চলছিল, কিন্তু গত বছর থেকে সেখানে লোকসান হচ্ছে। কর্মচারীরা ঠকাচ্ছে। রামানন্দ ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস হারাচ্ছে সবার ওপরে। সংসারটা ওর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে ব'লে রামানন্দর ধারণা। একতলার ভাড়াটে ভাড়া দেয় না। টাকাগুলো সব কোথায় যেন মনি-অর্ডার ক'রে পাঠিয়ে দেয়। কি সেই অদ্ভুত নামটা যেন? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, রেণ্ট-কন্‌ট্রোলার। ভাড়া চেয়ে পাঠালেই সতীশের হাতে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দেয় ভাড়াটে। চিঠিতে আর কিছুই লেখা থাকে না, কেবল ওই নামটা ছাড়া। সতীশ বলে, বাবু, তুমি ওদের উঠিয়ে দাও। দরকার হয় কিছু টাকা না হয় ওদের নগদই দিয়ে দেবে। দুজন মাদ্রাজী বাবু ক মাস থেকে আমাকে খোসামোদ করছে। হাজার টাকা আগাম তো দেবেই, তার ওপরে মাসের পয়লা তারিখে ভাড়া পাওয়া যাবে। বাঙালী বাঙালী ব'লে হাই তুললে তো আর টাকা আসে না!

কিন্তু আমি তুলব কি ক'রে?

আদালত কর।

আদালত? সে আমি চিনি না। তা ছাড়া তোর বউমাকে ফেলে আদালতে গিয়ে ব'সে থাকব কি ক'রে? এর ওপর আবার লেকচার তৈরি করতে হবে। না সতীশ, পৃথিবীতে আমি ঠকতেই এসেছি। ওষুধের দোকানটাও গেল। কেবল চুরি করছে ওরা।

কর্মচারীরা বলে কি জান?

কি ব'লে ?

বলে যে, বউমা নাকি ওষুধ খেয়ে দোকানটা ফেল করিয়ে দিচ্ছে! কম্পাউণ্ডার ব্যাটাকে খুব শুনিয়ে দিয়েছি।

সর্বনাশ করেছিস সতীশ।

কেন বাবু ?

ওরা রেগে গেলে আরও বেশি ক'রে চুরি করবে যে! নাঃ, সংসারটা বড্ড গণ্ডগোলের জায়গা। কে এক শম্ভুদা অন্তরালে ব'সে কি খেলাই যে খেলছে! দে, ওই মোটা বইখানা দে তো। লেক্‌চার তৈরি করতে হবে। ছেলেগুলো আজকাল কি বজ্জাতই যে হয়েছে! কেবল প্রশ্ন করে দিনরাত। সিলেবাসের বাইরে থেকে আমিই বা পড়াতে যাব কেন? দুনিয়ায় আর যেন কোন দর্শনই নেই, কেবল মার্কসবাদ ছাড়া। দে, ওই কার্ল মার্কসকে এদিকে ঠেলে দে।

কি নাম বললে বাবু ?

কিচ্ছু না, রেণ্ট-কন্‌ট্রোলার না কি সব ছাইভস্ম নাম আজকাল হয়েছে! ঘরের পুঁজি সব ওইখানে গিয়ে জমা হচ্ছে। কর্পোরেশনের খাজনা বাকি প'ড়ে গেল। ওই দেখ্‌, বউমা বোধ হয় ডাকছে!

দোতলায় থাকে মাধবীলতা। বিছানার সঙ্গে একটা সুইচ ক'রে দিয়েছে ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রি। ওটা টিপলেই তিনতলায় লাইব্রেরি-ঘরে আওয়াজ হয়। আওয়াজ শুনে সতীশ ছুটে গেল মাধবীলতার কাছে।

মোটা বইখানা নিয়ে রামানন্দ নাড়াচাড়া করতে লাগল। পড়বার মত মনের অবস্থা তার নেই। শুরুতেই যেন সে বুড়িয়ে গেছে। দক্ষিণ-খোলা বাড়িটায় লেক থেকে তাজা হাওয়া আসে দিন-রাত। তিনতলার ঘরে জানলা খুলে বসা যায় না, বাতাস এসে সব কাগজপত্র উড়িয়ে ফেলে দেয় মেঝেতে। রামানন্দ জানলাগুলো তাই বন্ধ ক'রেই রাখে। সতীশ চ'লে যাওয়ার পর রামানন্দ মোটা বইখানা তুলে রেখে দিয়ে এল শেল্‌ফের ওপর।

সিলেবাসের বাইরে সে কোন আলোচনাই করবে না। কিন্তু শম্ভুদা? সে-ই বা মোটা বইটা থেকে কম যায় কি? সাংসারিক জীবনে গোলমাল তো সেই বাধিয়েছে। কি দরকার ছিল বাপু, আমাকে বিয়ে করবার? শম্ভুদার সঙ্গে পালিয়ে গেলেই তো হ'ত? এখনও যদি মাধবীলতা যেতে চায়, তা হ'লে রামানন্দ টাকা-পয়সা দিয়ে ওদের সাহায্যও করতে পারে। কিন্তু এখানেও আবার গোল বাধিয়েছে রেণ্ট-কন্‌ট্রোলার। মাসিক তিন শো ক'রে টাকা তাঁর কাছে গিয়ে জমা হচ্ছে প্রায় এক বছর থেকে। বাড়িটা তৈরি ক'রে রেখে গিয়ে বাবা যে কি মুশকিলেই ফেলে গেছেন রামানন্দকে! তার চেয়ে হ্যারিসন রোডের কোন একটা হোটেলের ভাত খেয়ে কলেজে অধ্যাপনার কাজ করাই ছিল ভাল। দশ কাঠা জমি আর ওষুধের দোকানটা না থাকলে মাধবীলতার সঙ্গে তার বিয়ে হ'ত না। কিন্তু এখন সে কি করবে? ক্যাশ টাকা কই? ডাক্তারেরা সবাই মিলে আজ পাঁচ বছর থেকে কি কাণ্ডই না করছেন! শ্বশুর-শাশুড়ীর ওপরেও রামানন্দর আর বিশ্বাস নেই। তাঁরা জেনে-শুনে এমন একটা কাণ্ড ক'রে বসলেন! শম্ভুদাকে মেয়ে তাঁদের ভালবাসত, সে কথা তাঁরা ভাল ক'রেই জানতেন। কিন্তু লেক অঞ্চলের দশ কাঠা জমির লোভ ওঁরা ছাড়তে পারলেন না। বিয়ে দিলেন রামানন্দর সঙ্গে। এখন তবে সে কি করবে? সন্ধ্যের সময় শ্বশুর এলে, সে বাড়ির দলিলটা শ্বশুর-বাড়ির নামে লিখে দেবে ব'লেই মনে মনে ঠিক করল। সিন্ধুক থেকে দলিলটা সে বার ক'রে রাখবে। দলিলটা দিয়ে দেওয়ার পরে রামানন্দর কর্তব্য কি? হ্যারিসন রোডের কোন পান্থশালায় গিয়ে সে উঠবে ব'লে কর্তব্য তার স্থির করল।

আরও এক বছর কেটে গেল। কোন কিছুই পরিবর্তন হ'ল না। উন্নতি হ'ল না মাধবীলতার স্বাস্থ্যের। সেই মোটা বইটা নিয়ে কলেজে তার গণ্ডগোল লেগেই রইল। রামানন্দ আর কোন দর্শনের বই পড়বে না ব'লে মনস্থির ক'রে রেখেছে। ভাড়াটের কাছে সতীশকে আর পাঠায় না। ভাড়া সে কমিয়ে দিয়েছে অনেক। তিন শো থেকে দু শো হয়েছে ভাড়া। তাও সে সময়মত

পায় না। আর শম্ভুদা? তাকে জয় করবার চেষ্টা করছে রামানন্দ। সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে এবার জয় করবে। অন্তরালের রহস্য আর থাকতে দেবে না সে।

মাইনের টাকা খরচ ক'রে রামানন্দ সব ডাক্তারী বই কিনতে লাগল। কিনল সে একটা স্টেথেস্কোপও। কলেজ থেকে বেরিয়ে সে প্রতিদিন হাঁটতে হাঁটতে চ'লে আসে মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত। পূবদিকের দরজা দিয়ে ঢুকে রামানন্দ বেরিয়ে আসে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর ফটক দিয়ে। এই পথটা অতিক্রম করতে ভাল লাগে ওর।

লাইব্রেরি-ঘরটা ভ'রে উঠেছে ডাক্তারী বই দিয়ে। দর্শনের বইগুলো বস্তার মধ্যে ভরতি ক'রে চিলেকোঠায় তালাবন্ধ ক'রে রেখেছে। দেওয়ালের গায়ে ব্রাকেটের ওপর ঝুলিয়ে রেখেছে স্টেথেস্কোপ। বাবারটাও ছিল ওর কাছে। কিন্তু বাবার ওপরে রামানন্দর ভীষণ রাগ। দশ কাঠা জমি কিনে তিনি ওর সর্বনাশ ক'রে গেছেন। অতএব বাবার স্টেথেস্কোপের ওপর ওর আর এক রত্তি আস্থা নেই।

ভবানীপুরের ওষুধের দোকান উঠে গেছে। উঠিয়ে দিয়েছে রামানন্দই। ওষুধগুলো সব বাড়িতে নিয়ে এসেছে। লাইব্রেরি-ঘরের দু দিকের শেল্ফে সাজিয়ে রেখেছে ওষুধের শিশি আর বোতলগুলো। শম্ভুদার সঙ্গে সে এবার লড়বে। মাধবীলতার শম্ভুদাকে ভাল লাগে কেন? শম্ভুদা ডাক্তার। আচ্ছা, তোমার ডাক্তারী বিদ্যে কত এবার আমি দেখে নেব! রামানন্দর সংগ্রাম-শক্তি বাড়তে লাগল প্রতিদিন। ডাক্তারী বই সে পড়তে লাগল সংসারের সব কিছু ভুলে গিয়ে।

সতীশ একদিন জিজ্ঞাসা করলে, বাবু, এ তুমি কি করছ? শোবার ঘরটা যে ডাক্তারখানা ক'রে তুললে?

ওষুধ তৈরি করছি সতীশ, গোলমাল করিস নে।

নিজের চেহারাটা একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখো তো? পাগলামির একটা সীমা আছে তো?

কি বললি ?

কিছু না। বউমা তোমায় ডাকছে।

এ ঘরের খবর বউমা যেন কিছু না জানতে পারে, বুঝলি ?

বুঝেছি। এখন যাও তার কাছে। সর, ঘরটা এখন ঝাঁট দিয়ে দি। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নষ্ট ক'রে কেবল বই কিনছ ! এত টাকা পেলে কোথায় ?

বাড়িটা বাঁধা দিয়েছি।—ফস ক'রে ব'লে ফেলল রামানন্দ।

অ্যাঁ, করেছ কি ? সর্বনাশ !—ছোট ছেলে হ'লে সতীশ বোধ হয় ঝাঁটা দিয়ে দু-চার ঘা লাগিয়ে দিতে পারত।

ঠিকই করেছি আমি। সর, নীচে যাই।—এই ব'লে রামানন্দ এল মাধবীলতার কাছে। বসল এসে বিছানার পাশেই।

মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করলে, ওগো, তোমার চেহারা এত খারাপ হয়েছে কেন ? চোখের নীচে কালি পড়েছে। আমি তোমায় সুখী করতে পারলুম না।

না না, কি যে বল তার ঠিক নেই। আমি তো ভালই আছি। অসুখ তো তোমার লতা।

অসুখটা আমার কি যেন এক অদ্ভুত রকমের। ঘুমুলেই মনে হয়, আমি যেন কোথায় চ'লে যাচ্ছি। ঘুমুতে ভয় করে। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে ডাক্তার সেনের মুখটা। লম্বা লম্বা আঙুলগুলো তাঁর যতক্ষণ না দেখতে পাই, মনে হয়, আমি আর বাঁচব না। আজ কি ডাক্তার সেন আসবেন না ?

আসবেন। তাঁকে তো বলাই আছে।

ডান দিকের কপালের রগটা আমার আজ সকাল থেকেই দবদব করছে। রাত্রিতে যে কি হবে, জানি না।

ওষুধ খেলেই সেরে যাবে। ভয় নেই।

রামানন্দ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। মনে মনে ভাবতে লাগল সে, ডাক্তার সেনের মুখটা দেখতে পায় লতা, আঙুলগুলোও নাকি তাঁরই ! শম্ভুদার

নামটা সে আমার কাছে গোপন ক'রেই যাচ্ছে। করুক গোপন, আমিও দেখে নেব।

দুপুরবেলা কলেজে গিয়েই রামানন্দ খবর পেল যে, প্রধান অধ্যক্ষ তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। রামানন্দ গেল তিনতলায় তাঁর অফিসে। প্রধান অধ্যক্ষ বললেন, ব্যাপার কি আপনার? দাড়ি কামান নি, নোংরা কাপড়, কলেজ কামাই করছেন যখন-তখন? ছেলেরা সব নালিশ জানিয়েছে যে, আপনার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে!

কই, না তো!—রামানন্দ তার নিজের মাথার ওপরেই হাত রাখল।

না? দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে ওসব ওষুধের নাম এল কি ক'রে? পড়াবেন আপনি দর্শনশাস্ত্র, অথচ হাতে ক'রে বই নিয়ে এসেছেন ফার্মাকোলজির?

রামানন্দ হাতের বইখানা আরও শক্ত ক'রে ধরল।

প্রধান অধ্যক্ষ বললেন, গভর্নিং বডির মীটিং হয়ে গেছে। এই নিন তাঁদের চিঠি। আপনাকে ছ মাসের জন্যে ছুটি দেওয়া হ'ল বিনে মাইনেতে। মাথার ব্যারাম যদি না সারে, তা হ'লে—। নমস্কার, আসুন আপনি।

কলেজ স্ট্রীটের ভিড়ের মধ্যে এসে রামানন্দ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এবার সে ডাক্তারী বই পড়বার অনেক সময় পাবে। কলেজে চাকরি করতে হয় ব'লে তার সময় অনেক নষ্ট হচ্ছিল। পা চালিয়ে হাঁটতে লাগল রামানন্দ। মেডিকেল কলেজের মধ্যে দিয়ে হাঁটবার সময় চলার গতি দিল কমিয়ে। এদিক ওদিকের বাড়িগুলোর মধ্যে কি হচ্ছে? ডাক্তারি। শম্ভুদাও নাকি এখানকার ডাক্তার হয়েছে! ফুঃ! দেখে নেব, এবার প্রচুর সময় পাওয়া গেছে।—এই ভেবে রামানন্দ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ থেকে বাস ধরল।

রাত অনেক হয়েছে। লাইব্রেরি-ঘরে রামানন্দ ব'সে ওষুধ তৈরি করছিল। ব্রেন থেকে সব ময়লা সাফ করবার ওষুধ। খেলে পুরনো স্মৃতি সব সাদা কাগজের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। সাফ করতে না পারলে রামানন্দর আর বেঁচে

থেকে লাভ নেই। মাধবীলতাকে নিয়ে সে যদি আবার গোড়া থেকে জীবনটা শুরু করতে না পারে, তা হ'লে দর্শন পড়াবার জন্যে সে আর বেঁচে থাকবে না। সিদ্ধান্ত তার অনড়। মাধবীলতার ওষুধের শিশিটা সে লুকিয়ে নিয়ে এসে রেখেছে। কাল সকালে সে যখন প্রথম দাগ ওষুধটা খাবে, তখন থেকেই রামানন্দর আরম্ভ হবে নতুন জীবন। আঃ, জীবন! দক্ষিণ দিকের জানলা দিয়ে ফুরফুর ক'রে বাতাস আসছে। রামানন্দর সামনে তৈরি হচ্ছে নতুন বেদ। পাঁচ রকম শিশি থেকে ওষুধ নিয়ে সে একটা গেলাসে ঢালল। গেলাসের মুখটা কাচের প্লেট দিয়ে ঢেকে খুব জোরে জোরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ব্রেনের ময়লা সাফ করবার ওষুধ তৈরি করল দার্শনিক রামানন্দ। এবার? এবার সে মাধবীলতার ওষুধের শিশিতে সেটা ভ'রে রেখে ছিপি দিয়ে মুখটা বন্ধ ক'রে রাখল। তার পরে? দেখে নেব, মহাবীর শম্ভুদাকে, দেখে নেব, কত বড় প্রতিদ্বন্দ্বী সে! এটা বিজ্ঞানের যুগ, হেলেনকে উদ্ধার করতে হবে বিজ্ঞানের অস্ত্র দিয়ে। শিশিটা দু হাত দিয়ে চেপে ধ'রে তুলে নিয়ে এল বুক পর্যন্ত। বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে রেখে রামানন্দ চোখ বুজে লেক-অঞ্চলের হাওয়া খেতে লাগল। এমন সময় ঘরে ঢুকল সতীশ।

মাধবীলতার ঘুম আসছে না। সন্ধ্যের সময় মা এসেছেন। আজ থাকবেন তিনি। হেমনলিনী দেবী ডাকলেন সতীশকে।

সতীশ, বাবু ওপরের ঘরে ব'সে কি করেন দিনরাত?

বই পড়েন। আর—

আর কি?

ওষুধপত্তর তৈরি করেন। মা, বাবু আর বেশিদিন বাঁচবেন না। এখন তো প্রায় পাগলই হয়ে গেছেন।

মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করলে, কারণটা কি? আমার অসুখের জন্যে বুঝি?

সতীশ জবাব দিল না।

হেমনলিনী দেবী বললেন, মাধু, ওর সর্বনাশ আমরাই করেছি। শত্তুর

সঙ্গেই তোর বিয়ে হওয়া উচিত ছিল। তুই যে তাঁকে বিয়ের পরেও ভুলতে পারবি নে, তা আমি ভাবি নি।

এসব কথা আজ তুমি আমায় বলছ কেন মা?

সতীশ বললে, উনি ঠিক কথাই বলেছেন বউমা। বাবু তো সেই কোন্ এক শম্ভুদার সঙ্গে দিনরাত লড়ছেন! তিনি ডাক্তার হয়েছেন বই প'ড়ে।

কথাগুলো সব অদ্ভুত ঠেকল মাধবীলতার কাছে। শম্ভুদা কোত্থেকে এল? তার কথা তো মাধবীর কিছুই মনে নেই। তা ছাড়া শম্ভুদাকে সে বিয়ে করবে ব'লে কোনদিনও মনে মনে ঠিক করে নি। দু-চার দিনের বেশি তার সঙ্গে তো ওর দেখাও হয় নি। হ্যাঁ, ডাক্তার সে বিয়ে করতে চেয়েছিল। রামানন্দ ডাক্তার হ'লেও তার আপত্তি হ'ত না। যে কোন একজন ডাক্তার হ'লেও বোধ হয় মাধবী সুখী হতে পারত। ভয় ওর কেটে যেত।

রাত হয়েছে অনেক। মেয়ের পাশে শুয়ে হেমনলিনী দেবী আজ সব কথাগুলোই নতুন ক'রে ভাবতে লাগলেন। মেয়েকে তিনি বুঝতে পারেন নি। ডাক্তার সেন ধরতে পারেন নি মাধবীলতার অসুখ। সব ব্যাপারটা আগে থেকে বুঝতে পারলে জীবন দুটো ওদের এমনভাবে নষ্ট হয়ে যেত না। চেষ্টা করলে হয়তো এখনও সব বাঁচানো যেতে পারে। কাল সকাল থেকে তিনি সেই চেষ্টাই করবেন। রামানন্দকে বুঝিয়ে দেবেন তিনি মাধবীর আসল ব্যারামটা। সত্যিকারের মায়ের কর্তব্য তিনি করতে পারেন নি। মেয়ের মনটাকে বোঝবার চেষ্টা করলে এমন বিপদ ঘটত না।

হঠাৎ মাধবীলতা বললে, মা, আমি আজ ওঁর কাছেই যাব। বিছানা থেকে উঠে পড়ল মাধবীলতা। বিছানার সঙ্গেই সুইচ।

হেমনলিনী দেবী সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিলেন। শাড়িটাকে গুছিয়ে নিল মাধবী, গুছিয়ে নিতে সাহায্য করলেন হেমনলিনী দেবী।

সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে মাধবী তিনতলায় উঠতে লাগল। সব কিছু ভয়কে

আজ সে তাড়িয়ে দেবার জন্তে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল। স্বামী তাকে ভুল বুঝেছেন। শম্ভুদাকে সে কোনদিনও ভালবাসে নি।

ঘরে ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে গেল মাধবীলতা। সতীশ তার স্বামীর বিছানায় শুয়ে আছে খালি গায়ে। রামানন্দ সতীশের বুকে স্টেথেস্কোপ লাগিয়েছে।

তুমি? আমার এখানে?—রামানন্দ এসে ধ'রে ফেলল মাধবীলতাকে।

তোমার ডাক্তারি দেখতে এলাম। ওগো, এবার আমি আমার সত্যিকারের ডাক্তার পেয়েছি।—শম্ভুদা তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী টাইফয়েড।

বিছানার ওপর মাধবীলতাকে বসিয়ে দিল রামানন্দ। হেমনলিনী দেবী এসে উপস্থিত হলেন মেয়ের পেছনে পেছনে। তিনি বললেন, আট বছর বয়সে ওর একবার টাইফয়েড হয়েছিল। সেই সময় ওর মনের মধ্যে কি রকম একটা ভয় ঢুকে যায়। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে ওর সামনে এসে দাঁড়ায় ডাক্তার সেন। ডাক্তার কেউ কাছে না থাকলে ও ভাবে, ওকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। রামানন্দ, এবার বোধ হয় মাধবী তার ডাক্তারকে পেল। আয় বাবা সতীশ, আমরা যাই। সতীশ যাবার জন্যে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল আগেই। হেমনলিনী দেবী সতীশকে নিয়ে চ'লে গেলেন। যাওয়ার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেলেন।

বিছানার চারদিকে স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে ডাক্তারী বই। মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করলে, ওগো, তুমি সত্যিই কি ডাক্তার হয়েছ?

মাধবীর কপালে চুমু খেয়ে রামানন্দ বললে, সত্যিই। তারপর সে ওষুধের শিশিটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল লেক-অঞ্চলের দিকে। দিয়ে বললে, ভগবান রক্ষা করেছেন, ওষুধটা তুমি খাও নি।

ডাক্তার সেনের দেওয়া ওষুধের শিশিটা কি ক'রে তিনতলায় এল, সে কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল মাধবীলতা।

'শনিবারের চিঠি'
শ্রাবণ ১৩৬১